HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজকর্ম ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৩ – সামাজিক সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মের অনুশীলন

টপিক – ০১ যুক্তিবিদ্যা ও দর্শন

টপিক

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ০১: সামাজিক সমস্যার ধারণা
টপিক ০২: জনসংখ্যা সমস্যা
টপিক ০৩: বাংলাদেশের জনসংখ্যা পরিস্থিতি
টপিক ০৪: বেকারত্ব
টপিক ০৫: অপুষ্টি
টপিক ০৬: যৌতুক
টপিক ০৭: বাল্যবিবাহ
টপিক ০৮: মাদকাশক্তি
টপিক ০৯: অটিজম
টপিক ১০: জলবায়ু পরিবর্তন
টপিক ১১: এইচআইভি/এইডস

টপিক

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ১২: অনুশীলনী বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

টপিক ১৩: সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

টপিক ০১: সামাজিক সমস্যার ধারণা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

সামাজিক সমস্যার ধারণা

কোন সমাজই সামগ্রিকভাবে পরিপূর্ণ নয়। সমাজ বিকাশের কোন পর্যায়েই সমাজ সমস্যামুক্ত ছিল না। সব সমাজে কোন না কোন ধরনের সমস্যা বিদ্যমান ছিল। কারণ সমাজ গঠনের অপরিহার্য উপাদান হল মানুষ। আর একাধিক মানুষ থাকলে তাদের মধ্যে পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া (Interaction) থাকবে। আর পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া থেকে স্বাভাবিকভাবেই সমস্যা সৃষ্টি হবে এবং সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টাও চলতে থাকবে। সামাজিক সমস্যা সমাধানের অব্যাহত প্রচেষ্টাই সমাজকে আদিম পর্যায় হতে বর্তমান পর্যায়ে উপনীত করেছে। সুতরাং বলা যায়, সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টাই সামাজিক পরিবর্তনের মূল নিয়ামক। সামাজিক সমস্যা না থাকলে সমাজ স্থবির হয়ে পড়তো।

সামাজিক সমস্যার ধারণা

সমাজ এবং সমস্যা পরস্পর অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত। সমাজ থাকলে সমস্যাও থাকবে, তবে সব সমস্যাকে, সামাজিক সমস্যা বলা যায় না।

ইংরেজি 'Problem' শব্দের বাংলা পরিভাষা 'সমস্যা'। গ্রীক শব্দ 'Problema' হতে ইংরেজি 'Problem' শব্দের উৎপত্তি; যার অর্থ হলো, এমন একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা, যা মানুষের চিন্তাভাবনার বা মনোযোগ আকর্ষণের চাপ সৃষ্টি করে।' যখন মানুষ কোন নিক্ষেপিত ঘটনা দ্বারা অন্তরায় বা বাধার সম্মুখীন হয়, তখন সেটি সমস্যা রূপে বিবেচিত হয়। আর সমস্যার সঙ্গে মানুষের পারস্পরিক সামাজিক সম্পর্ক, প্রচলিত জীবনধারা, সামাজিক আদর্শ ও সামাজিক মূল্যবোধ সংশ্লিষ্ট থাকে, তখন সমস্যাকে সামাজিক (Social) শব্দ দ্বারা বিশেষিত করে সামাজিক সমস্যা (Social problem) হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

এ প্রসঙ্গে সমাজবিজ্ঞানী নিস্কেট এবং মার্টন (Nisbet and Merton) বলেছেন, "সামাজিক সমস্যার সঙ্গে সমাজের লোকদের পারস্পরিক সম্বন্ধ এবং প্রচলিত জীবনধারাগত আদর্শ বা মূল্যবোধ জড়িত থাকে বলে সামাজিক শব্দ দ্বারা সমস্যাকে বিশেষিত করা হয়।" (The Social Problems are in the sense that they pertain to human relationship and to the normative contexts to which all human relationships exist.)*

সামাজিক সমস্যার ধারণা

সামাজিক সমস্যার সংজ্ঞা

সামাজিক সমস্যা হলো কোন সমাজের অধিক সংখ্যক লোকের অবাঞ্ছিত ও আপত্তিজনক আচরণ, যে আচরণ পরিবর্তনের প্রয়োজন জনগণ অনুভব করে। সামাজিক সমস্যা মানুষের পারস্পরিক সামাজিক সম্পর্ক ও সামাজিক মিথস্ক্রিয়া থেকে উদ্ভূত। বিচ্ছিন্ন এবং ব্যক্তিগত সমস্যাকে সামাজিক সমস্যা বলা হয় না।

রবার্ট এল বার্কার (Robert L Barker) প্রণীত সমাজকর্ম অভিধানের (১৯৯৫) ব্যাখ্যানুযায়ী, সামাজিক সমস্যা হলো জনগণের মধ্যেকার এমন একটি অবস্থা, যার প্রভাবে কিছু লোকের মূল্যবোধ ও আদর্শের বিচ্যুতি ঘটে, যা মানুষের আবেগীয় অথবা আর্থিক দুর্গতির কারণ হয়। সামাজিক সমস্যার উদাহরণ হলো অপরাধ, সামাজিক বৈষম্য, দারিদ্র্য, বর্ণবাদ, মাদকের অপব্যবহার, সীমিত সম্পদের অসম বণ্টন।

(Social problem is conditions among people leading to social responses that violate some people's values and norms and cause emotional or economic suffering. Examples of social problems include crime, social inequality, poverty, racism, drug abuse, maldistributions of limited resources.)

সামাজিক সমস্যার ধারণা

সামাজিক সমস্যার সংজ্ঞা

সমাজবিজ্ঞানী এল কে ফ্রাঙ্ক (Lawrence K Frank) "American Journal of Sociology"-তে প্রকাশিত 'Social Problem' প্রবন্ধে সামাজিক সমস্যার সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। তাঁর মতে "সামাজিক সমস্যা বলতে এমন একটি সামাজিক অসুবিধা কিংবা অসংখ্য লোকের অসদাচরণকে বুঝায়, যাকে শোধরানো কিংবা দূর করা দরকার।" (Social problem is any difficulty or misbehaviour of fairly large number of persons which we wish to remove or correct.)*

সমাজবিজ্ঞানী পি বি হর্টন এবং জে আর লেসলী (Paul B. Horton and JR Leslie) তাঁদের "Sociology of Social Problems" গ্রন্থে বলেছেন "সামাজিক সমস্যা হলো সমাজ জীবনের এমন একটি অস্বাভাবিক অবস্থা, যা সমাজের উল্লেখযোগ্য অংশের উপর ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে এবং যার সম্পর্কে যৌথ সামাজিক কার্যক্রমের মাধ্যমে কিছু করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়।" (Social Problem is a condition affecting a significant number of people in ways considered undesirable and about which it is felt something can be done through collective social action.)

সামাজিক সমস্যার ধারণা

সামাজিক সমস্যার সংজ্ঞা

সামাজিক সমস্যার ব্যাপক এবং নির্দিষ্ট স্বরূপ নির্ধারণ করে ডেভিড ড্রেসলার (David Dressler) বলেছেন, "সামাজিক সমস্যা হলো মানুষের সামাজিক মিথক্রিয়া থেকে সৃষ্ট এমন একটি অবস্থা, যে অবস্থাকে সমাজের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোক অস্বাভাবিক বা অবাঞ্ছিত বলে বিবেচনা করে এবং প্রতিকার বা প্রতিরোধমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে দূরীকরণে তারা বিশ্বাসী হয়।" (A Social problem is a condition growing out of human interaction that is considered undesirable by a significant number of people who believe it can must be resolved through preventive of remiedial action.)*

সমাজবিজ্ঞানীদের প্রদত্ত বিভিন্ন সংজ্ঞার আলোকে বলা যায়, "সামাজিক সমস্যা হলো এমন একটি অবাঞ্ছিত বা অস্বাভাবিক অবস্থা যা সমাজের প্রতিষ্ঠিত রীতি-নীতি ও কল্যাণ বিরোধী এবং যে অস্বাভাবিক অবস্থা মানুষের পারস্পরিক সামাজিক সম্পর্ক ও জীবনযাত্রা ব্যাহত করে। যার প্রতিকারের জন্য সমাজের মানুষ যৌথ কার্যক্রম গ্রহণের প্রয়োজন অনুভব করে।"

সামাজিক সমস্যার ধারণা

সামাজিক সমস্যার বৈশিষ্ট্য

সামাজিক সমস্যার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো সামাজিক সম্পর্ক ও সামাজিক মিথক্রিয়া থেকে এর উদ্ভব। সামাজিক আদর্শ ও মূল্যবোধ সামাজিক সমস্যার সঙ্গে সম্পৃক্ত।

সমাজের বৃহৎ জনগোষ্ঠীর উপর ক্ষতিকর প্রভাব সামাজিক সমস্যার লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য। বিচ্ছিন্ন কোন অবস্থাকে সামাজিক সমস্যা বলা যায় না। সমাজের বৃহৎ জনগোষ্ঠীর উপর বিচ্ছিন্ন ও ব্যক্তিগত সমস্যার প্রভাব না পড়া পর্যন্ত, তা সামাজিক সমস্যারূপে গণ্য হয় না। সমাজের সামগ্রিক মঙ্গলের পরিপন্থী বলে গণ্য হলে, তাকে সামাজিক সমস্যা বলে আখ্যায়িত করা হয়। যেমন প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় কোনো শিক্ষার্থী প্রত্যাশিত ফল লাভে ব্যর্থ হয়ে উপযুক্ত চাকরী না পেয়ে বেকার হলে, তা বিচ্ছিন্ন ও ব্যক্তিগত সমস্যা বলে বিবেচিত। কিন্তু যদি শিক্ষা ব্যবস্থা সামাজিক প্রয়োজন মেটাতে অক্ষম হবার প্রভাবে শিক্ষিত বেকার সৃষ্টি হয়, তবে তা সামাজিক সমস্যা রূপে গণ্য হবে।

সামাজিক সমস্যা পরিমাপযোগ্য হতে হবে। সমাজ বিজ্ঞানী ফান্সিস ই ম্যারিল (Fancis E Merrill) সামাজিক সমস্যার অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য হিসেবে অস্বাভাবিক অবস্থাকে পরিমাপযোগ্য অর্থাৎ সমাধানযোগ্য হতে হবে বলে মত পোষণ করেছেন। যে অস্বাভাবিক অবস্থার বিরূপ প্রভাব বা প্রতিক্রিয়া পরিমাপযোগ্য নয়, তাকে সামাজিক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা যায় না। সমস্যার গতি প্রকৃতিই সমস্যা পরিমাপের বা সমাধানের নির্দেশনা দান করে। পরিমাপযোগ্য বলেই সামাজিক সমস্যা সমাধানযোগ্য। যেমন প্রাকৃতিক কারণে সৃষ্ট বন্যা, নদীর ভাঙ্গন সামাজিক সমস্যা নয়। কিন্তু এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাবে সৃষ্ট দরিদ্রতা, স্বাস্থ্যহীনতা সামাজিক সমস্যা রূপে গণ্য।

সামাজিক সমস্যার ধারণা

সামাজিক সমস্যার বৈশিষ্ট্য

সামাজিক সমস্যা প্রচলিত সামাজিক আদর্শ ও মূল্যবোধের পরিপন্থী হয়। যখন কোনো অস্বাভাবিক অবস্থা প্রচলিত সামাজিক মূল্যবোধ ও আদর্শের প্রতি হুমকির সৃষ্টি করে, তখন তাকে সামাজিক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। সমাজবিজ্ঞানী ফান্সিস ম্যারিল প্রচলিত সামাজিক মূল্যবোধের প্রতি হুমকি সৃষ্টি করাকে সামাজিক সমস্যার অপরিহার্য উপাদান হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

সমাজ পরিবর্তনশীল এবং সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে সামাজিক সমস্যার গতি-প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়। সময় ও স্থানভেদে সামাজিক সমস্যার প্রকৃতিতে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন পাশ্চাত্যের উন্নত দেশে দারিদ্র্য বলতে যে অবস্থাকে বুঝানো হয়, বাংলাদেশের মতো অনুন্নত দেশে সে অবস্থাকে বুঝানো হয় না।

সামাজিক সমস্যার ধারণা

সামাজিক সমস্যার বৈশিষ্ট্য

মানুষের ধ্যান-ধারণা, মূল্যবোধের পরিবর্তন হলেও সামাজিক সমস্যার ধারণাগত পরিবর্তন ঘটে। যেমন, এক সময় দাস এবং সতীদাহ প্রথার প্রবর্তন সমাজে অনুমোদিত ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে মানুষের ধ্যান-ধারণা পরিবর্তিত হওয়ায় দাসপ্রথা এবং সতীদাহ প্রথা সামাজিক সমস্যায় পরিণত হয়।

সামাজিক সমস্যার ধারণা

সামাজিক সমস্যার বৈশিষ্ট্য

ক্রমাগত প্রতিক্রিয়া ও পারস্পরিক নির্ভরশীলতা সামাজিক সমস্যার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। সমাজের বিভিন্ন অংশ পরস্পর অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত ও নির্ভরশীল। সমাজের একদিকে বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে, অন্যদিকের উপর এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এক দিককে কেন্দ্র করে সৃষ্ট সমস্যা এককভাবে সমাজে বিরাজ করে না, সমাজের অন্যান্য দিকেও এর প্রভাব পড়ে। প্রফেসর গিলীন (Prof. Gillin) বলেছেন, "All social problems grow out of the social problems, the problem of the adjustment of man to his universe and the social universe to man." যেমন, চক্রাকারে ক্রিয়াশীল দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রের প্রভাবে পুষ্টিহীনতা, স্বাস্থ্যহীনতা, নিরক্ষরতা, ভিক্ষাবৃত্তি, অপরাধ প্রবণতা, অধিক জন্মহার প্রভৃতি সমস্যার সৃষ্টি হয়। আবার স্বাস্থ্যহীনতার ফলে কর্মক্ষমতা হ্রাস পেয়ে উপার্জন ব্যাহত হলে মানুষ দারিদ্র্যের শিকার হতে পারে। এভাবে সামাজিক সমস্যার ক্রমাগত প্রতিক্রিয়া (Chain reaction) ও পারস্পরিক সম্পর্কের (Interrelated) প্রভাবে সমাজে বহুমুখী সমস্যার সৃষ্টি হয়। কোন সমস্যা একক এবং বিচ্ছিন্নভাবে সমাজে বিরাজ করে না। একটি সামাজিক সমস্যা অন্যটির কারণ হিসেবে বিরাজ করে। স্বাস্থ্যহীনতা,।

সামাজিক সমস্যার ধারণা

সামাজিক সমস্যার বৈশিষ্ট্য

বিশেষ সামাজিক সমস্যা সর্বজনীন। সমাজে বিরাজমান এমন কতগুলো বিশেষ সামাজিক সমস্যা রয়েছে যেগুলো সর্বজনীন। আর্থ-সামাজিক অবস্থার বিভিন্নতা ও পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক সমস্যাও বিভিন্ন হয়। তবে মানুষের কতকগুলো মৌলিক মানবিক চাহিদা সর্বজনীন এবং এগুলোকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট সামাজিক সমস্যাগুলোও সর্বজনীন। যেমন দরিদ্রতা, অপরাধ প্রবণতা প্রভৃতি সমাজে সবসময় বিদ্যমান ছিল, বর্তমানেও রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। শুধু মাত্রাগত দিক হতে এসব সমস্যার পরিবর্তন হয়।

যৌথ প্রচেষ্টার প্রয়োজন অনুভূত হওয়া সামাজিক সমস্যার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যে কোন অস্বাভাবিক অবস্থাকে সামাজিক সমস্যা হিসেবে আখ্যায়িত করা যায় না, যতক্ষণ পর্যন্ত অস্বাভাবিক ও ক্ষতিকর অবস্থা দূরীকরণের বা মোকাবেলা করার লক্ষ্যে যৌথ প্রচেষ্টার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত না হয়। অর্থাৎ অস্বাভাবিক পরিস্থিতি সম্পর্কে জনগণের উদ্বেগ ও সচেতনতা সৃষ্টি না হলে, তাকে সমস্যা বলা যাবে না। যেমন- সতীদাহ প্রথা প্রচলিত হবার পর এটি সমস্যা হিসেবে বিবেচিত হয়নি। কিন্তু যেদিন থেকে মানুষ সতীদাহ প্রথার অমানবিক দিক সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠে এবং এর বিরুদ্ধে কিছু করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে, তখন হতে সতীদাহ প্রথা সমস্যারূপে বিবেচিত হয়।

সামাজিক সমস্যার ধারণা

সামাজিক সমস্যার বৈশিষ্ট্য

যে কোন সমস্যা সমাধানের পূর্বশর্ত হচ্ছে সমস্যার উৎস সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা। সমস্যার মূল উৎস না জেনে সমস্যার দীর্ঘমেয়াদী সমাধান আশা করা যায় না। সামাজিক সমস্যার মূল উৎস হল সমাজ। ত্রুটিপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থা এবং সামাজিক বিশৃঙ্খলা থেকেই সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি হয়।

সমাবিজ্ঞানী সি এম কেইস (CM Case) 'Analysing Social Problem' গ্রন্থে সামাজিক সমস্যার উৎস হিসেবে চারটি বিষয়কে চিহ্নিত করেছেন। এগুলো হলো- ১. প্রতিকূল প্রাকৃতিক অবস্থা ২. জনসংখ্যার ত্রুটিপূর্ণ প্রকৃতি ৩. অসংগঠিত ও ত্রুটিপূর্ণ সামাজিক বিন্যাস এবং ৪. বিভিন্ন শ্রেণীর আদর্শ ও মূল্যবোধের দ্বন্দ্ব।

সামাজিক সমস্যার কারণ সম্পর্কে সমাজবিজ্ঞানীদের উপরোক্ত বক্তব্য হতে প্রতীয়মান হয়, সামাজিক সমস্যার একক ও সর্বজনীন কারণ নির্ণয় সম্ভব নয়। প্রত্যেক সমাজবিজ্ঞানীই সামাজিক সমস্যার কারণ হিসেবে প্রাকৃতিক, জৈবিক, মানসিক এবং সাংস্কৃতিক উপাদানের যে কোন একটির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এখানে সামাজিক সমস্যার প্রধান কারণগুলো সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

সামাজিক সমস্যার ধারণা

সামাজিক সমস্যার বৈশিষ্ট্য

অতিরিক্ত জনসংখ্যা সামাজিক সমস্যার অন্যতম প্রধান কারণ। সমাজবিজ্ঞানী উলফ (Wolf) তার Reading to Social Problems) গ্রন্থে অতিরিক্ত জনসংখ্যার প্রভাবে যখন মানুষের মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণ সম্ভব হয় না, তখন মৌল চাহিদা অপূরণজনিত কারণে বিভিন্ন সমস্যার উদ্ভব হয়। অনুন্নত দেশে সীমিত শিল্পায়নের ফলে উৎপাদন যে হারে বৃদ্ধি পায়, সে তুলনায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অনেক বেশি হওয়ায় মানুষের সার্বিক চাহিদা পূরণ ব্যাহত হয়ে সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি করে। যেমন- বাংলাদেশে বেকারত্ব, দরিদ্রতা, স্বাস্থ্যহীনতা, পুষ্টিহীনতাসহ অসংখ্য সমস্যার প্রধান কারণ হচ্ছে অপরিকল্পিত জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং জনসংখ্যার ত্রুটিপূর্ণ গঠন।

অপরিকল্পিত সামাজিক পরিবর্তন সামাজিক সমস্যার অন্যতম কারণ। সমাজ পরিবর্তনশীল এবং সামাজিক পরিবর্তন বিভিন্নভাবে সংঘটিত হয়। পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার সঙ্গে মানুষ যখন সামঞ্জস্য বিধানে ব্যর্থ হয়, তখন সামাজিক সমস্যার উদ্ভব হয়। অপরিকল্পিত সামাজিক পরিবর্তনের প্রভাবে বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতা হ্রাস ও ভূমিকা পালনের ব্যর্থতা হতে সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হয়। গতিশীল সমাজে মানব আচরণ যতো দ্রুত পরিবর্তন হয়, আচরণ নির্ধারণকারী সামাজিক আদর্শ ও মূল্যবোধ দ্রুত পরিবর্তন হয় না। মনীষী এফ এম মেরিল (FM Merrill) এর ভাষায়, "Social problems are products of a dynamic society in which behaviour changes more rapidly than the values that define it (behaviour)."

সামাজিক সমস্যার ধারণা

সামাজিক সমস্যার কারণ

জলবায়ু পরিবর্তন এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ সামাজিক সমস্যার অন্যতম প্রধান কারণ। সমাজ বহির্ভূত (Non-social) যেসব কারণে সামাজিক সমস্যার উদ্ভব হয় সেগুলোর মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তন এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ অন্যতম। প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে সমাজস্থ মানুষ এবং তাদের জীবনধারার অসঙ্গতি ঘটলে সামাজিক সমস্যা দেখা দেয়। বিশেষ করে বন্যা, ভূমিকম্প, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় মানুষ খাপ খাওয়াতে ব্যর্থ হলে সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হয়। বৈশ্বিক উষ্ণতার প্রভাবে বন্যা, খরা, অতিবৃষ্টি, জলোচ্ছাস, নদীভাঙ্গন ও ভূমিকম্পের প্রভাবে বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার উদ্ভব হয়। প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে বাংলাদেশে ধারাবাহিক প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিপুল পরিমাণ জানমালের ক্ষতি হচ্ছে। তার প্রভাবে বিরাজমান সামাজিক সমস্যা জটিল এবং নতুন সমস্যার উদ্ভব হচ্ছে। এ ছাড়া নদীভাঙ্গনে প্রতি বছর অসংখ্য লোক পরিবেশ উদ্বাস্তুর শিকার হচ্ছে। দারিদ্র্য, পুষ্টিহীনতা, স্বাস্থ্যহীনতা, দুঃস্থ ও অসহায় শিশুদের সমস্যা, অপরাধ প্রবণতা প্রভৃতি সমস্যার অন্যতম কারণ হলো প্রাকৃতিক দুর্যোগ। জাফর-এই ভাত খাও ও ফেছার আলম জাহান

সামাজিক সমস্যার ধারণা

সামাজিক সমস্যার কারণ

সামাজিক সমস্যার পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ও ক্রমাগত প্রতিক্রিয়ার (Chain Reaction) অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সমাজের বিভিন্ন দিক পরস্পর নির্ভরশীল বিধায় একক ও বিচ্ছিন্নভাবে কোন সমস্যা সমাজে বিরাজ করে না। একটি সমস্যা একাধারে নিজে যেমন সমস্যারূপে বিরাজ করে, তেমনি অন্যান্য সমস্যার কারণ হিসেবে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এ প্রসঙ্গে প্রফেসার গিলীন (Prof. Gillin) বলেন, "All social Problems grow out of the social problems." যেমন দারিদ্র্য একটি অর্থনৈতিক সমস্যা। জনগণের মাথাপিছু আয় কম এবং জীবনযাত্রার মান হ্রাস পেলে দারিদ্র্য সমস্যার সৃষ্টি হয়। আবার স্বাস্থ্যহীনতা, পুষ্টিহীনতা, নিরক্ষরতা, ভিক্ষাবৃত্তি, অপরাধ প্রবণতা প্রভৃতি সমস্যার অন্যতম কারণ হলো দারিদ্র্য।

সামাজিক সমস্যার ধারণা

সামাজিক সমস্যার কারণ

অসম সাংস্কৃতিক পরিবর্তন সামাজিক সমস্যার অন্যতম প্রধান কারণ। মানুষের জীবনধারার পরিপূর্ণ রূপ হলো সংস্কৃতি। সংস্কৃতির দুটি দিক হলো বস্তুগত সংস্কৃতি এবং অবস্তুগত সংস্কৃতি। দালানকোঠা, রাস্তাঘাট, শিল্প কারখানা ইত্যাদি বস্তুগত সংস্কৃতির উদাহরণ। অন্যদিকে সামাজিক আদর্শ, মূল্যবোধ, মানুষের চিন্তা, মনোভাব ইত্যাদি অবস্তুগত সংস্কৃতি। বস্তুগত ও অবস্তুগত সংস্কৃতির ভারসাম্যহীনতা সামাজিক সমস্যার কারণ হিসেবে প্রভাব বিস্তার করে। সমাজবিজ্ঞানী অগবার্ন এবং নিমকফ (Ogburn and Nimkoff) এর মতে, মানব সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে অসম পরিবর্তনজনিত অসঙ্গতি হতে সামাজিক সমস্যা ও সামাজিক বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়।

সামাজিক সমস্যার ধারণা

সামাজিক সমস্যার কারণ

সামাজিক সমস্যার অন্যতম কারণ রাজনৈতিক অস্থিরতা। যে কোন দেশের উন্নয়ন এবং সামাজিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার অন্যতম পূর্বশর্ত হচ্ছে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা। রাজনৈতিক অস্থিরতা প্রভাবে বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে স্ব-স্ব ভূমিকা পালনে অক্ষম হয়। এতে সমাজে সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও সমস্যা সৃষ্টির অনুকূল পরিবেশ বিরাজ করে। এছাড়া যুদ্ধ ও রাজনৈতিক সংঘাতের প্রভাবেও সমাজে সমস্যার সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশে পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৯৭-২০০২) পরিকল্পিত উন্নয়নের প্রধান প্রতিবন্ধক হিসেবে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতাকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

সম্পদ ও সুযোগ সুবিধার অসম বণ্টন সামাজিক সমস্যা সৃষ্টির মৌলিক কারণসমূহের মধ্যে অন্যতম। দার্শনিক কার্লমার্কসের মতে, অর্থনৈতিক বৈষম্যই সামাজিক বিশৃঙ্খলার অন্যতম প্রধান কারণ। সম্পদের অসম বণ্টনের প্রভাবে বিশ্বের দরিদ্র ও অনুন্নত দেশগুলোর বৃহৎ জনগোষ্ঠী ন্যূনতম মৌল চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হয়ে মানবেতর জীবনযাপন করতে বাধ্য হচ্ছে।

সামাজিক সমস্যার ধারণা

সামাজিক সমস্যার কারণ

মূল্যবোধের দ্বন্দ্ব হতে অনেক সময় সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হয়। মানুষের আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণের নিয়ামক হচ্ছে মূল্যবোধ। সমাজের পরস্পরবিরোধী গোষ্ঠী ও দলের নিজস্ব মূল্যবোধ, আদর্শ এবং জীবনধারা রয়েছে। বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠীর মূল্যবোধগত দ্বন্দ্বের প্রভাবে সমস্যার সৃষ্টি হয়। আবার সমাজ পরিবর্তনের প্রভাবে প্রচলিত মূল্যবোধ ও আদর্শের পরিবর্তন ঘটে এবং নতুন মূল্যবোধ সৃষ্টি হয়। এমতাবস্থায় নতুন এবং সনাতন মূল্যবোধের মধ্যে যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়, তার প্রভাবে সমাজে অনেক সমস্যা দেখা দেয়। সামাজিক সমস্যা হলো বর্তমান জটিল ও গতিশীল সমাজের সৃষ্ট অস্বাভাবিক অবস্থা। যেখানে মানুষের বাহ্যিক আচার-আচরণ দ্রুত পরিবর্তিত হলেও, সামাজিক মূল্যবোধ, আদর্শ ও মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে না।

সামাজিক সমস্যার গুরুত্বপূর্ণ উৎস হলো শিল্পায়ন ও নগরায়নের প্রভাব। শিল্পায়ন এবং নগরায়নের প্রভাবে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হয়। পতিতাবৃত্তি, বস্তি জীবনের উদ্ভব, সাংস্কৃতিক শূন্যতা প্রভৃতি সমস্যা নগরায়ন ও শিল্পায়নের প্রত্যক্ষ প্রভাবে দেখা দেয়। নগরায়ন ও শিল্পায়নের প্রভাবে দ্রুতহারে বস্তুগত পরিবর্তন হলেও সামাজিক অর্থাৎ অবস্তুগত পরিবর্তন সে অনুপাতে হয় না। যা সামাজিক সমস্যার জন্য বিশেষভাবে দায়ী।

সামাজিক সমস্যার ধারণা

সামাজিক সমস্যার কারণ

সামাজিক সমস্যা সৃষ্টির ক্ষেত্রে বর্ণবৈষম্য এবং সাম্প্রদায়িকতার প্রভাব বিশেষ ভূমিকা পালন করে। উগ্র সাম্প্রদায়িকতা এবং জাতীয়তাবোধ সামাজিক সমস্যার উর্বর ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। শ্রীলঙ্কা, বসনিয়ার জাতিগত সংঘাত এবং আফ্রিকা ও ইউরোপের শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গ দ্বন্দ্ব হতে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোতে সৃষ্ট উত্তেজনাকর পরিবেশ হতে বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে।

সামাজিক সমস্যার কারণ হিসেবে প্রাকৃতিক সম্পদের স্বল্পতা প্রভাব বিস্তার করে। প্রাকৃতিক সম্পদ দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মৌল উপাদান। বাংলাদেশের মতো জনবহুল দেশে প্রাকৃতিক সম্পদের অভাবে উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে। গ্যাস ছাড়া বাংলাদেশে উল্লেখ করার মতো প্রাকৃতিক সম্পদ নেই। ভূমি ও পানি সম্পদ সীমিত। পানি সম্পদের উৎস প্রতিবেশী দেশ ভারত, নেপাল ও মায়ানমারে অবস্থিত বিধায় এক্ষেত্রে ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা বিরাজ করছে। সামাজিক সমস্যার সঙ্গে প্রাকৃতিক সম্পদের অভাব প্রত্যক্ষভাবে জড়িত।

সামাজিক সমস্যার ধারণা

সামাজিক সমস্যার কারণ

সামাজিক উত্তেজনা সামাজিক সমস্যা সৃষ্টির কার্যকর প্রভাবক। সামাজিক সমস্যার অন্যতম কার্যকর প্রভাবক হলো সামাজিক উত্তেজনা, সামাজিক টানাপোড়ন এবং সামাজিক দ্বন্দ্ব (Social tension and conflict)। সামাজিক শ্রেণিবিন্যাসের প্রভাবে সৃষ্ট উত্তেজনা হতে সামাজিক দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। আর সামাজিক দ্বন্দ্ব থেকে শ্রেণি বৈষম্য, বর্ণবাদ, সাম্প্রদায়িকতা ইত্যাদি উত্তেজনাকর অবস্থা সৃষ্টি হয়।

সামাজিক সমস্যার ধারণা

সামাজিক সমস্যার কারণ

সমাজ একটি অখণ্ড যৌগিক সত্তা (Complex whole)। সমাজের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক, পরিবেশগত প্রভৃতি দিক পরস্পর নির্ভরশীল ও অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত।

এজন্য কোন সামাজিক সমস্যাই একক এবং বিচ্ছিন্নভাবে সমাজে বিরাজ করে না। একটি সামাজিক সমস্যা অন্যটির কারণ হিসেবে বিরাজ করে। সামাজিক সমস্যার নির্ভরশীলতা এবং ক্রমাগত প্রতিক্রিয়া (Chain reaction) থেকেই সামাজিক সমস্যার উদ্ভব ঘটে। সামাজিক সমস্যার আন্তঃসম্পর্ক এবং প্রভাব উদাহরণের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যায়।

সামাজিক সমস্যার ধারণা

সামাজিক সমস্যার আন্তঃসম্পর্ক

দারিদ্র্য সামাজিক সমস্যা হিসেবে স্বীকৃত। দারিদ্র্য একক এবং বিচ্ছিন্নভাবে সমাজে বিরাজ করছে না। দারিদ্র্যের প্রভাবে বিকলাঙ্গতা, পুষ্টিহীনতা, স্বাস্থ্যহীনতা প্রভৃতি জৈবিক ও দৈহিক সমস্যা দেখা দেয়। দারিদ্র্য মানুষের মধ্যে ব্যর্থতাজনিত হতাশা সৃষ্টি করে। আর হতাশা এবং ব্যর্থতা থেকে নেশাগ্রস্ততা, অপরাধ প্রবণতা, ব্যক্তিত্বের সামঞ্জস্যহীনতা, আত্মহত্যা প্রবণতা প্রভৃতি সমস্যা দেখা দেয়। দারিদ্র্যের প্রভাবে বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক সমস্যা যেমন যৌতুকপ্রথা, বিবাহ বিচ্ছেদ প্রভৃতি সামাজিক বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। দারিদ্র্যের প্রভাবে মাথাপিছু আয় কম থাকে বলে সঞ্চয় হয় না। সঞ্চয়ের অভাবে মূলধন গঠন ও বিনিয়োগ ব্যাহত হয়। বিনিয়োগ কম হলে কর্মসংস্থানের অভাবে বেকারত্ব দেখা দেয়। অর্থাৎ দারিদ্র্য থেকেই দারিদ্র্যের উদ্ভব। দুর্নীতি, সামাজিক বিশৃঙ্খলা, রাজনৈতিক অস্থিরতা প্রভৃতির পেছনে দারিদ্র্যের প্রভাব রয়েছে।

সামাজিক সমস্যার ধারণা

সামাজিক সমস্যার আন্তঃসম্পর্ক

দারিদ্র্যের প্রভাবে আয় কম হয় বলে, পুষ্টিকর খাদ্যসহ স্বাস্থ্য রক্ষার প্রয়োজনীয় খাদ্য সংগ্রহ ও গ্রহণ সম্ভব হয় না। পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে দরিদ্র জনগোষ্ঠী স্বাস্থ্যহীনতা, পুষ্টিহীনতা, ভগ্নস্বাস্থ্য, দুর্বল কর্মক্ষমতা প্রভৃতি দেখা দেয়। এতে শ্রমের উৎপাদনক্ষমতা হ্রাস পায়। আবার দারিদ্র্যের প্রভাবে স্বল্প আয়ের কারণে শিক্ষার সুযোগ হ্রাস পায়। ফলে সমাজে নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতা বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে দারিদ্র্যের প্রভাবে উচ্চ জন্মহার প্রবণতা দেখা দেয়; যা জনসংখ্যা সমস্যা বৃদ্ধির সহায়ক। জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে অধিক শ্রম সরবরাহের কারণে বেকারত্ব বৃদ্ধি পায়। বেকারত্বের উচ্চহার দারিদ্র্য প্রসারের সহায়ক। সুতরাং দেখা যায়, দারিদ্র্য এমন একটি সমস্যা যা থেকে বহুমুখী সমস্যার সৃষ্টি হয়। অর্থনীতিবিদ র‍্যাগনার নার্কস দারিদ্র্য সমস্যার বহুমুখী প্রভাব দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র তত্ত্বের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে, দারিদ্র্যের কারণেই একটি দেশ দরিদ্র। সমাজবিজ্ঞানী গিলীন সামাজিক সমস্যাগুলো আন্তঃসম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে মন্তব্য করেছেন, "Al social problems grow out of the social problems.” অর্থাৎ একটি সামাজিক সমস্যা থেকে আরেকটি সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি হয়।

সামাজিক সমস্যার ধারণা

সামাজিক সমস্যার আন্তঃসম্পর্ক

জনসংখ্যাস্ফীতি অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের অন্যতম সামাজিক সমস্যা। অতিরিক্ত জনসংখ্যার প্রভাবে বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার উদ্ভব হয়। অতিরিক্ত জনসংখ্যার প্রভাবে মানুষ যখন খাদ্য, বস্ত্র, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, চিত্তবিনোদন প্রভৃতি মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হয় তখন দারিদ্র্য, স্বাস্থ্যহীনতা, পুষ্টিহীনতা, নিরক্ষরতা, অজ্ঞতা, অপরাধ, দুর্নীতি, বেকারত্ব, নেশাগ্রস্ততা, পরিবেশ দূষণ প্রভৃতি সমস্যা দেখা দেয়। অতিরিক্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধি যেমন একটি সমস্যা; তেমনি অন্যান্য সামাজিক সমস্যার কারণ হিসেবে প্রভাব বিস্তার করে।

আবার জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ বিশ্লেষণ করলে দরিদ্রতা, নিরক্ষরতা, অজ্ঞতা, বাল্যবিবাহ, বেকারত্ব প্রভৃতি সমস্যার প্রভাবকে চিহ্নিত করা যায়। সামাজিক সমস্যাগুলোর পারস্পরিক নির্ভরশীলতা এবং ক্রমাগত প্রতিক্রিয়া (Chain reaction) হতে এগুলোর আন্তঃসম্পর্ক ও আন্তঃপ্রভাব স্পষ্ট হয়ে উঠে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজকর্ম ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৩ – সামাজিক সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মের অনুশীলন

টপিক – ০২ জনসংখ্যা সমস্যা

টপিক ০২: জনসংখ্যা সমস্যা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

জনসংখ্যা সমস্যা

বিশ্বের আলোচিত সমস্যা জনসংখ্যা বিস্ফোরণ। জনসংখ্যা বিস্ফোরণের ভয়াবহতা সম্পর্কে সতর্ক করে ১৯৭৭ সালে বিশ্বব্যাংকের সাবেক প্রেসিডেন্ট রবার্ট ম্যাকনামারা বলেছিলেন, পারমাণবিক যুদ্ধ ছাড়া বিশ্ববাসীর সম্মুখে অন্যতম যে গুরুতর সমস্যা, তা হচ্ছে জনসংখ্যাস্ফীতি। অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে এটি পারমাণবিক যুদ্ধের চেয়েও ভয়াবহ। কারণ, জনসংখ্যাস্ফীতিকে সংঘবদ্ধভাবে নিয়ন্ত্রণের উপায় নেই। বিশ্বের পারমাণবিক শক্তিধর কয়েকটি রাষ্ট্রের সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টায় পারমাণবিক যুদ্ধের সম্ভাবনা হ্রাস করা সম্ভব। কিন্তু জনসংখ্যা বিস্ফোরণের ক্ষেত্রে এরূপ করা সম্ভব নয়। কারণ, সন্তান জন্মদান মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি এবং ব্যাক্তিগত চাহিদা, রুচি, দৃষ্টিভঙ্গি, আদর্শ ও মূল্যবোধের উপর নির্ভরশীল।

জনসংখ্যা সমস্যা

জনসংখ্যা ধারণা

জনসংখ্যা বলতে নির্দিষ্ট অঞ্চল বা এলাকার সকল মানুষকে বুঝানো হয়। একটি অঞ্চলের সকল জনগোষ্ঠি অথবা কোন অঞ্চলের বিশেষ অধিবাসীকে জনসংখ্যা প্রত্যয় দ্বারা বুঝানো হয়। সমাজকর্ম অভিধানের ব্যাখ্যানুযায়ী (১৯৯৫), "জনসংখ্যা বলতে কোন একটি জাতির বা নির্দিষ্ট এলাকার মোট জনসংখ্যা অথবা একটি এলাকার বিশেষ শ্রেণীর বা দলের (যেমন- নারী, রোমান ক্যাথলিক, কৃষ্ণাঙ্গ জনগোষ্ঠী এবং অক্ষম জনগোষ্ঠী) অন্তর্ভুক্ত জনগোষ্ঠীকে বুঝায়।" জনবিজ্ঞানের পরিভাষায়, নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট অঞ্চল বা দেশে পারস্পরিক সম্পর্কে আবদ্ধ এবং সংঘবদ্ধভাবে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর সমষ্টিকে জনসংখ্যা বলা হয়।

মনীষী উইলিয়াম পি স্কট (William P Scott) প্রণীত 'Dictionary of Sociology'-র ব্যাখ্যানুযায়ী, "নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমায় যেমন একটি জাতি, একটি ভৌগোলিক অঞ্চল, রাষ্ট্র, মেট্রোপলিটন এলাকা, একটা শহরে বসবাসরত সকল জনগোষ্ঠীকে জনসংখ্যা বলা হয়।"

জনসংখ্যা সমস্যা

জনসংখ্যা সমস্যার ধারণা

জনসংখ্যা এবং প্রাপ্ত সম্পদের মধ্যে সামঞ্জস্যহীনতা দেখা দিলে অর্থাৎ সম্পদের তুলনায় জনসংখ্যা অধিক হলে অথবা সম্পদের তুলনায় জনসংখ্যা কম হবার কারণে সম্পদ অব্যবহৃত থাকলে তাকে জনসংখ্যা সমস্যা বলা হয়। জনসংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় কম থাকলেও সমস্যা; পক্ষান্তরে, প্রয়োজনের তুলনায় বেশি হলেও সমস্যা। অধিক জনসংখ্যা এবং স্বল্প জনসংখ্যা (Over population and under population) বিপরীতমুখী দু'টি অবস্থা।

সাধারণভাবে বলা যায়, যখন কোন দেশের প্রাপ্ত সম্পদের তুলনায় জনসংখ্যা অধিক এবং এ অধিক জনসংখ্যার প্রভাবে সেদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ব্যাহত হয়, তখন তাকে জনসংখ্যাস্ফীতি বলা হয়। আর যখন স্বল্প সময়ে জনসংখ্যা অস্বাভাবিক দ্রুত হারে বৃদ্ধি পেয়ে সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক অবস্থার বিপর্যয়ের কারণ হিসেবে দেখা দেয়, তখন তাকে জনসংখ্যা বিস্ফোরণ বলে।

জনসংখ্যা সমস্যা

জনসংখ্যা সমস্যার ধারণা

প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ম্যালথাস (১৭৯৮ সালে) 'An Essay on the Principle of Population' প্রবন্ধে বলেছেন, "কোন দেশের জনসংখ্যা সে দেশের মোট খাদ্য উৎপাদনের চেয়ে বেশি হলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়, তাকে জনসংখ্যা সমস্যা বলা হয়।" তাঁর মতে, জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় অনেকটা জ্যামিতিক হারে। যেমন- ১, ২, ৪, ৮, ১৬ প্রভৃতি হারে। সে তুলনায় খাদ্য উৎপাদন বাড়ে গাণিতিক হারে। যেমন- ১, ২, ৩, ৪, ৫ হারে। ম্যালথাসের মতে, প্রতি ২৫ বছর পর পর জনসংখ্যা দ্বিগুণ হয়।

জনসংখ্যা সমস্যার দু'টি দিক রয়েছে। যেমন-

প্রথম, দেশের প্রাপ্ত সম্পদের তুলনায় জনসংখ্যা কম হলে সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের অভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যাহত হয়ে জনগণের জীবন মান হ্রাস পায়। জনসংখ্যার এরূপ অবস্থাকে স্বল্প জনসংখ্যা সমস্যার (Under Population) অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

জনসংখ্যা সমস্যা

জনসংখ্যা সমস্যার ধারণা

দ্বিতীয়, দেশের প্রাপ্ত সম্পদের তুলনায় জনসংখ্যা অধিক হলে জাতীয় উন্নয়ন ব্যাহত হয়। জনসংখ্যার এরূপ অস্বাভাবিক আধিক্যকেও জনসংখ্যা সমস্যা (Over Population) বলা হয়।

আবার যখন দেশের জনসংখ্যা ও সম্পদ সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় এবং মাথাপিছু আয় সর্বোচ্চ পর্যায়ে এসে দাঁড়ায়, তখন জনসংখ্যাকে কাম্য জনসংখ্যা (Optimum Population) বলা হয়। তবে কাম্য জনসংখ্যা একটি আপেক্ষিক ধারণা। কারণ, দেশের উৎপাদন ও সম্পদ বৃদ্ধি পেলে কাম্য জনসংখ্যার ধারণা পরিবর্তিত হয়।

পৃথিবীর জনসংখ্যা বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশের জনসংখ্যা ১৯৫০ সালের পর দ্রুতহারে বৃদ্ধি পেয়ে এমন ভয়াবহ আকার ধারণ করে, জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে অনসংখ্যা বিস্ফোরণ (Population Bomb) হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

জনসংখ্যা সমস্যা

জনসংখ্যা সমস্যার ধারণা

১৯৬০ সালের পর থেকে বিশ্বের জনসংখ্যা সবচেয়ে দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এমতাবস্থায় জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধির ভয়াবহতা সম্পর্কে সতর্ক ধারণা দেয়ার জন্য জনসংখ্যা বিস্ফোরণ প্রত্যয় ব্যবহার করা হয়। বিশেষ করে ১৯৬৮ সালে পল এলরিখের ক্লাসিক্যাল গ্রন্থ The Population Bomb' প্রকাশিত হবার পর জনসংখ্যা বিস্ফোরণ সম্পর্কে চিন্তাবিদগণ হুঁশিয়ার ও সচেতন হয়ে উঠেন। জনসংখ্যা বিস্ফোরণ দ্বারা স্বল্প সময়ের মধ্যে অস্বাভাবিক গতিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারকে নির্দেশ করে।

বিশ্ব জনসংখ্যা বিস্ফোরণের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট আলোচনা করলে দেখা যায়, জনসংখ্যা একশত কোটিতে পৌঁছাতে মানব ইতিহাসের প্রথম আঠারশত বছর লেগেছে। ১৮০৪ সালে বিশ্বের জনসংখ্যা এক'শ কোটি ছাড়িয়ে যায়। এর পর জনসংখ্যা দু'শ কোটিতে পৌঁছতে প্রায় ১২৩ বছর অর্থাৎ ১৯২৭ সালে বিশ্বের জনসংখ্যা দু'শ কোটিতে পৌঁছে। ১৯৬০ সালের পর প্রতি ১২-১৪ বছরের ব্যবধানে জনসংখ্যা একশত কোটি করে বৃদ্ধি পায়। যার প্রভাবে বিগত পঞ্চাশ বছরে বিশ্ব জনসংখ্যা দ্বিগুণের বেশি হয়। নিচের টেবিলে বিশ্ব জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধির হার দেখানো হলো।

জনসংখ্যা সমস্যা

জনসংখ্যা সমস্যার ধারণা

বিশ্ব জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রবনতা

সন	প্রাককলিত বিশ্ব জনসংখ্যা	জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রবনতা
৮০০০ বিসি	৫ মিলিয়ন	–
১৬৫০ এসি	৫০০ মিলিয়ন	১,৫০০ বছর
১৮৫০	এক বিলিয়ন	২০০ বছর
১৯৩০	দু'বিলিয়ন	৮০ বছর
১৯৭৫	চার বিলিয়ন	৪৫ বছর
১৯৯৯	ছয় বিলিয়ন	২৪ বছরে দুই বিলিয়ন বৃদ্ধি
২০১১	সাত বিলিয়ন	১২ বছরে এক বিলিয়ন বৃদ্ধি

জনসংখ্যাবিদদের প্রাককলন অনুযায়ী ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্ব জনসংখ্যা ৮.৬ বিলিয়ন ২০৫০ সালের মধ্যে ৯.৮ বিলিয়ন এবং ২১০০ সাল নাগাদ ১১.২ বিলিয়েন পৌঁছবে।

জনসংখ্যা সমস্যা

জনসংখ্যা সমস্যার ধারণা

সন্তান জন্মদান ও বংশবৃদ্ধি মানুষের সহজাত জৈবিক প্রবণতা। অন্যদিকে, জনসংখ্যার সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো এটি ক্রমবর্ধমান। তবে বিশেষ কারণে সাময়িকভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রবণতা ব্যাহত হতে পারে। যেমন-দুর্ভিক্ষ, মহামারী, যুদ্ধ বিগ্রহ, বিলম্ব বিবাহ, জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি কারণে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ব্যাহত হতে পারে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির মতো জৈবিক মৌল প্রক্রিয়ার সঙ্গে যেমন অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রশ্ন জড়িত, তেমনি দর্শন, নীতিবোধ, ধর্ম, মনস্তত্ত্ব প্রভৃতি বিষয় জড়িত। সুতরাং জনসংখ্যা সমস্যার কারণ বিশ্লেষণ করতে হলে সামগ্রিক ও বহুমুখী দৃষ্টিকোণ (Comprehensive and multidimensional approach) হতে বিশ্লেষণ করা যুক্তিযুক্ত। বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির উল্লেখযোগ্য কারণগুলো সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো।

জনসংখ্যা সমস্যা

জনসংখ্যা সমস্যার ধারণা

বাংলাদেশের আবহাওয়া ও খাদ্যাভ্যাস জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে প্রভাব বিস্তার করে। ভৌগোলিক অবস্থানের দিক থেকে বাংলাদেশ নাতিশীতোষ্ণ মৌসুমী অঞ্চলে অবস্থিত। ফলে এদেশে নর-নারী তুলনামূলকভাবে অল্পবয়সেই সন্তান উৎপাদন বা প্রজনন ক্ষমতা অর্জন করে। এটি বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করছে। ১৯৫৭ সালে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার উপর হল্যান্ডের পরিচালিত গবেষণায় তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে, অতিমাত্রায় শ্বেতসার জাতীয় যেমন- ভাত, গম, আলু প্রভৃতি খাদ্য গ্রহণ এবং স্বল্পমাত্রায় আমিষ যেমন- মাছ, মাংস, ডিম প্রভৃতি গ্রহণ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে অধিক জন্মহারের কারণ হিসাবে প্রভাব বিস্তার করে। বাংলাদেশ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একটি দরিদ্র দেশ হিসেবে খাদ্য গ্রহণের প্রকৃতি অধিক জন্মহারের সহায়ক। বাংলাদেশের জনগণের খাদ্যে আমিষের অভাব এবং শ্বেতসারের আধিক্য প্রজনন ক্ষমতার ক্ষেত্রে অনুকূল প্রভাব সৃষ্টি করছে। 'বিশ্ব জনসংখ্যা-১৯৯৮' এর তথ্যানুযায়ী বাংলাদেশের নারী প্রজনন উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন। অল্প বয়স্ক মেয়েদের প্রজনন ক্ষমতা শ্রীলঙ্কার চেয়ে, বাংলাদেশের মেয়েদের পাঁচগুণ বেশি। বাংলাদেশ জনমিতি ও স্বাস্থ্য জরিপ ২০১১ এর তথ্যানুযায়ী ১৯ বছরের মধ্যে প্রতি তিনজনের একজন কিশোরী গর্ভধারণ করছে।

জনসংখ্যা সমস্যা

জনসংখ্যা সমস্যার ধারণা

জন্ম ও মৃত্যুহারের বৈষম্য জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রধান কারণ। জন্মহার হলো জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রধান নির্ধারক। চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতির প্রভাবে বর্তমানে শিশু মৃত্যুর হার অতীতের তুলনায় হ্রাস পাচ্ছে এবং গড় আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি পাচ্ছে। শিশু মৃত্যুহার হ্রাস এবং আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি জনসংখ্যাস্ফীতির সহায়ক। বাংলাদেশের জন্ম, মৃত্যু ও আয়ুষ্কাল সম্পর্কিত পরিসংখ্যান নিচে দেয়া হলো।

সন	১৯৯০	২০১৭
স্থূল জন্ম প্রতি হাজারে	৩২.৮	১৮.৫
স্থূল মৃত্যু প্রতি হাজারে	১১.৪	৫.১
শিশুমৃত্যু প্রতি হাজারে ১ বছরের নীচে	৯৪.০	২৪
ফার্টিলিটি হার (প্রতি মহিলা)	৪.৩	২.০৫
আয়ুকাল	৫৬.১	৭২.০
জনসংখ্যা স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার	২.১৪	১.৩৭

উৎস : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৯।

জনসংখ্যা সমস্যা

জনসংখ্যা সমস্যার ধারণা

দারিদ্র্য জনসংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। বাংলাদেশের জনগণের জীবনযাত্রার মান ও মাথাপিছু আয় অত্যন্ত কম। জীবনযাত্রার মান ও সন্তান জন্মদানের মধ্যে বিপরীতমুখী সম্পর্ক বিদ্যমান। জনগণের স্বাভাবিক প্রবণতা হলো উচ্চশ্রেণি তাদের স্বাচ্ছন্দ্য জীবনযাত্রার মান বজায় রাখার জন্য কম সন্তান কামনা করে। পক্ষান্তরে, দরিদ্র শ্রেণি তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য অধিক সন্তান কামনা করে। মি. ডি ক্যাস্ট্রো (D Castro) তাঁর বিখ্যাত 'Geography of Hunger' গ্রন্থে বলেছেন, খাদ্যাভাসের কারণে দারিদ্র ও ক্ষুধার্ত মানুষের প্রজনন ক্ষমতা অপেক্ষাকৃত বেশি। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য।

বাংলাদেশে দারিদ্র্যের প্রভাবে সন্তান জন্মদানের প্রবণতা অধিক। অর্থনীতিবিদ র‍্যাগনার নার্কস-এর দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র বিশ্লেষণের একটি মাত্রা (Dimension) হলো-

জনসংখ্যা সমস্যা

জনসংখ্যা সমস্যার ধারণা

কৃষিভিত্তিক সমাজকাঠামো জনসংখ্যা বৃদ্ধির সহায়ক কারণ হিসেবে প্রভাব বিস্তার করে। বাংলাদেশের সমাজ কাঠামো কৃষিভিত্তিক। কর্মসংস্থানের সিংহভাগ কৃষিখাতে হয়ে থাকে। প্রবীণ বয়সের নিরাপত্তা এবং কৃষি কাজের স্বার্থে এখানে পুত্র সন্তান মূল্যবান সম্পদ হিসেবে বিবেচিত। এ কারণে গ্রামীণ এলাকায় অধিক সন্তান জন্মদানের প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। বাংলাদেশের যৌথ পরিবার ব্যবস্থা উচ্চ জন্মহারের অনুকূল। সনাতন গ্রামীণ জনপদে যৌথ পরিবারে সন্তান জন্মদান ও লালন-পালন তেমন ব্যয়বহুল এবং কষ্টসাধ্য ব্যাপার নয়। ফলে সন্তান জন্মদানকে তেমন ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে গণ্য করা হয় না।

জনসংখ্যা সমস্যা

জনসংখ্যা সমস্যার ধারণা

নারী শিক্ষার নিম্নহার জনসংখ্যা বৃদ্ধির সহায়ক। বাংলাদেশে নারীদের মধ্যে নিরক্ষরতার হার অধিক, যা প্রজনন হারকে প্রভাবিত করছে। আদমশুমারী ২০১১ এর তথ্যানুযায়ী ৭ বছর বয়সের উপরে নারী শিক্ষার হার মাত্র ৪৯.৪ ভাগ। ২০১৭ সালের তথ্যানুযায়ী ৭০.২ শতাংশ (অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৯)। সমাজবিজ্ঞানী কিংসলি ডেভিস-এর মতে, নারীর অক্ষরজ্ঞান ও শিক্ষা, তার সন্তান সংখ্যার সাথে বিপরীতমুখী সম্পর্ক সৃষ্টি করে। বাস্তব তথ্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যায় যেদেশে নারী শিক্ষার হার বেশি, সে দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি হার কম। এর কারণ—

- নারীদের পড়ালেখায় অধিক সময় অতিবাহিত হয় বলে দেরিতে বিবাহ হওয়া
- শিক্ষিত কর্মজীবী মহিলারা সংসারের বাইরে কর্মে ব্যস্ত থাকার কারণে কম সন্তান কামনা করে ।
- শিক্ষিত কর্মজীবী মহিলাদের মধ্যে জীবন সম্পর্কে অধিক সচেতনতা থাকে বলে কম সন্তানকামনা করে।
- কর্মজীবী শিক্ষিত মহিলাদের ক্ষমতায়ন, সামাজিক ও পারিবারিক মর্যাদা অধিক থাকে বলে তারা মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা পায়। যা সন্তান জন্মদানে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

সামাজিক সমস্যার ধারণা

জনসংখ্যা সমস্যার ধারণা

বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি প্রকাতার অন্যতম প্রধান প্রভাবক ধর্মীয় অনুশাসন ও মূল্যবোধের প্রভাব। জন্ম শাসন এবং পরিকল্পিত পরিবার গঠনকে ধর্মীয় মূল্যবোধ বিরোধী কাজ বলে অনেক মুসলমান মনে করে। হিন্দু শাস্ত্রের বক্তব্য হলো 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা; পুত্র পিন্ড প্রয়োজনম্। অর্থাৎ পুত্রের জন্য স্ত্রী আর পিন্ডের জন্য পুত্রের প্রয়োজন। যে ব্যক্তি পুত্রহীন অবস্থায় দেহ ত্যাগ করে, পরলোকে তাকে পুৎ নামক নরকে বাস করতে হয়। আর 'পুত্' নামক নরক থেকে পুত্রই শুধু উদ্ধার করতে পারে। তাই তাকে পুত্র বলা হয়।' হিন্দু ধর্মে পিতা-মাতার মুখাগ্নির জন্য ছেলে সন্তান অপরিহার্য। হিন্দুদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিতে ছেলেদের গুরুত্ব অধিক। এজন্য হিন্দু সমাজে ছেলে সন্তান সবাই কামনা করে। তবে বর্তমানে গণমাধ্যম, তথ্যপ্রযুক্তি ও যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের প্রভাবে এরূপ মনোভাব ক্রমশ পরিবর্তিত হচ্ছে।

জনসংখ্যা সমস্যা

জনসংখ্যা সমস্যার ধারণা

নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতা জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। ২০১১ সালের আদমশুমারীর তথ্যানুযায়ী বাংলাদেশের সাক্ষরতার হার ৭ বছর বয়সের উপরের পুরুষ সাক্ষরতার হার ৫৪.১ এবং নারী ৪৯.৪ ভাগ। ২০১৭ এর তথ্যানুযায়ী যথাক্রমে ৭৪.৩ এবং ৭০.২ শতাংশ। অর্থাৎ তুলনামূলকভাবে অধিক জনগোষ্ঠী নিরক্ষর ও অজ্ঞ। ফলে অধিক সন্তানের সমস্যা ও অসুবিধা নিয়ে তারা সামষ্টিকভাবে চিন্তিত নয়। বিশেষ করে অশিক্ষিত ও অজ্ঞ দরিদ্র ও নিম্নশ্রেণির মধ্যে এরূপ চিন্তাধারা বিদ্যমান। বাংলাদেশের নিরক্ষর ও অজ্ঞ দরিদ্র জনগোষ্ঠী অনেকক্ষেত্রে দায়িত্বহীনভাবে অধিক সন্তান জন্ম দিয়ে থাকে।

জনসংখ্যা সমস্যা

জনসংখ্যা সমস্যার ধারণা

বাল্যবিবাহ জনসংখ্যা বৃদ্ধির সহায়ক। কারণ বিবাহকালীন বয়স প্রজনন হারের উপর প্রভাব বিস্তার করে। মহিলাদের প্রজনন সময় সাধারণত ১৫-৪৯ বছর। সুতরাং মহিলা যত তাড়াতাড়ি বিবাহ করবেন জন্মহার ততো বেশি হওয়া স্বাভাবিক। একজন মহিলা প্রজননক্ষম বয়সের যতো বেশি সময় বিবাহিত অবস্থায় থাকবেন, ততো জন্মহার বেশি হবার সম্ভাবনা থাকে। জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল (UNFPA) প্রকাশিত বিশ্ব জনসংখ্যা পরিস্থিতি প্রতিবেদনের তথ্যানুযায়ী বাল্যবিবাহ বেশি এমন ২০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের স্থান তৃতীয়। বাংলাদেশ জনমিতি ও স্বাস্থ্য জরিপ ২০১১ এর তথ্যানুযায়ী ১৮ বছর পূর্ণ হবার আগে ৬৬ শতাংশ কিশোরীর বিয়ে হয়। ১৯ বছরের আগে প্রতি তিনজনের একজন গর্ভধারণ করে। দেশে কিশোরী মাতৃত্বের হার ৩৩ শতাংশ। বাংলাদেশে মেয়েদের গড় বিবাহের বয়স উন্নত দেশ অপেক্ষা অনেক কম। মেয়েদের বাল্যবিবাহের আধিক্য জনসংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ হিসেবে স্বীকৃত।

জনসংখ্যা সমস্যা

জনসংখ্যা সমস্যার ধারণা

বাংলাদেশে সামাজিক নিরাপত্তার অভাব জনসংখ্যার কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। বাংলাদেশে ব্যাপক সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি গৃহীত হয়নি। বৃদ্ধ বয়সের আর্থিক নিরাপত্তাজনিত অনিশ্চয়তার দরুণ দেশের মানুষ অধিক পুত্রসন্তান কামনা করে। বিশেষ করে পুত্র সন্তান কামনার মূল প্রবণতা হলো বৃদ্ধ বয়সের সামাজিক নিরাপত্তা। বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা কেন্দ্র (BIDS) জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ সংশ্লিষ্ট ড. এমএ মান্নান-এর গবেষণার রিপোর্টে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ হিসেবে পুত্র সন্তান লাভের তীব্র আকাঙ্খা এবং সমাজ জীবনে নারীর নিম্ন মর্যাদাকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

পরিশেষে বলা যায়, জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রধান নিয়ামক হলো জন্মহার। আবার সন্তানের জন্ম নির্ভর করে আর্থ-সামাজিক অবস্থা, পারিবারিক গঠন, শিক্ষা, সচেতনতা, দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ প্রভৃতি চলকের উপর। জন্মহার বৃদ্ধির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পরস্পর নির্ভরশীল আর্থ-সামাজিক উপাদানসমূহের মধ্যে রয়েছে উন্নয়নের স্তর, শিক্ষার মান ধর্ম, স্থানান্তরের হার, আয়, পরিবেশ, পারিবারিক গঠন ও আকার সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি, সন্তানের গুরুত্ব, জন্ম নিয়ন্ত্রণ ব্যবহার সম্পর্কিত জ্ঞান ও মনোভাব প্রভৃতি।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজকর্ম ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৩ – সামাজিক সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মের অনুশীলন

টপিক – ০৩ বাংলাদেশের জনসংখ্যা পরিস্থিতি

টপিক ০৩: বাংলাদেশের জনসংখ্যা পরিস্থিতি

This Topic is important for

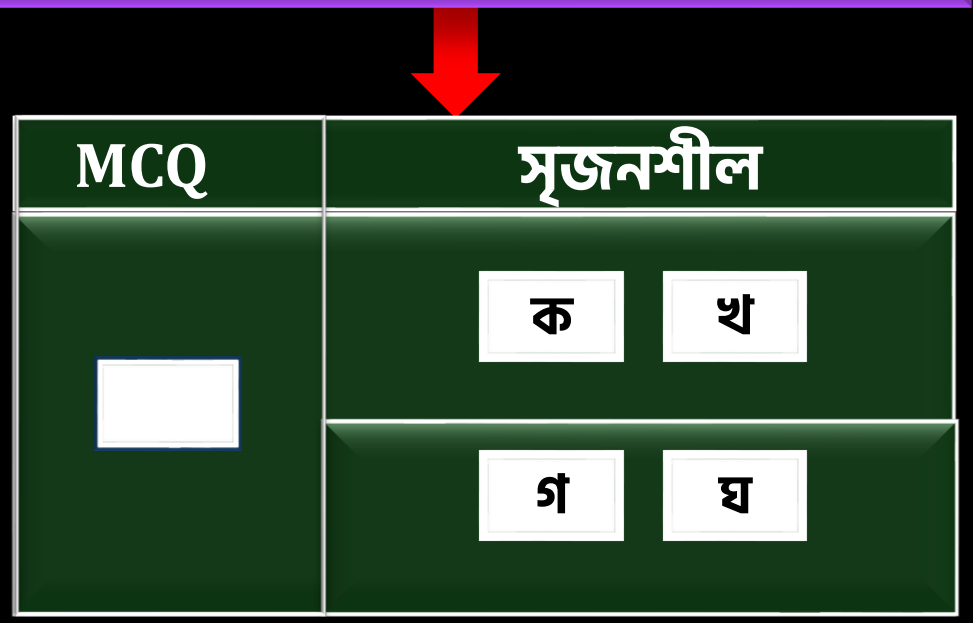

বাংলাদেশের জনসংখ্যা পরিস্থিতি

বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম জনসংখ্যাবহুল দেশ। জনসংখ্যার দিক হতে বাংলাদেশ বিশ্বের অষ্টম এবং এশিয়ার পঞ্চম জনসংখ্যাবহুল দেশ। ২০১১ এর শুমারী জরিপের তথ্যানুযায়ী বাংলাদেশে গণনাকৃত জনসংখ্যা প্রায় ১৪ কোটি ২৩ লাখ ১৯ হাজার। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৩৪ শতাংশ। অন্যদিকে সমন্বিত জনসংখ্যা ১৪ কোটি ৯৭ লাখ ৭২ হাজার এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির শতকরা হার ১.৩৭ ভাগ। জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ১০১৫ জন। পুরুষ এবং মহিলা অনুপাত ১০০.৩ জন। ২০১৮ সালের তথ্যানুযায়ী প্রাককলিত জনসংখ্যা ১৬৩.৭ মিলিয়ন। জনসংখ্যার ঘনত্ব ১১০৩ জন বৃদ্ধির হার ১.৩৭ এবং পুরুষ মহিলা অনুপাত ১০০.২

বাংলাদেশের জনসংখ্যা পরিস্থিতি

জনসংখ্যা সমস্যার ধারণা

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর বাংলাদেশে ১৫ কোটি ২৫ লাখ জনসংখ্যা ভিত্তি এবং বৃদ্ধির হার ১.৩৭ শতাংশ ধরে জনসংখ্যা ঘড়ি স্থাপন করেছে। এ হিসেবে বাংলাদেশে প্রতি ১৫ সেকেন্ডে একজন শিশু এবং প্রতি মিনিটে চারজন, ঘণ্টায় ২৪০ জন এবং প্রতিদিন ৫৭৬০ জন শিশু জন্ম নেয়। এ হিসেবে বছরে প্রায় ২০ লাখ ৭৩ হাজার ৬০০ জন শিশু জন্ম নেয়।

বাংলাদেশের জনসংখ্যা পরিস্থিতি

বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রবণতাঃ

যে ভূখণ্ড নিয়ে বাংলাদেশ গঠিত, তাতে ১৬৫০ সালে জনসংখ্যা ছিল এক কোটি। দীর্ঘ ২১১ বছর পর জনসংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে ১৮৬১ সালে দু'কোটিতে উপনীত হয়। পরবর্তী ৪০ বছরে এদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে তিন কোটিতে পৌঁছে। ১৯২১ সালের পর এদেশের জনসংখ্যা দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পেতে থাকে। বিভিন্ন আদমশুমারির আলোকে ১৯০১ সাল থেকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির গতি সারণীতে দেখানো হলো-

বাংলাদেশের জনসংখ্যা পরিস্থিতি

বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির গতি (১৯০১-২০১১)

আদমশুমারীর সন	মোট জনসংখ্যা	পার্থক্যের সংখ্যা	পার্থক্যের শতকরা হার	বার্ষিক বৃদ্ধির শতকরা হার
১৯০১-মার্চ ১	২,৮৯,২৭,৭৮৬	–	–	–
১৯১১-মার্চ ১০	৩,১৫,৫৫,০৫৬	২৬,২৭,২৭০	৯.০৮	০.৮৭
১৯২১-মার্চ ১৮	৩,৩২,৫৪,০৯৬	১৬,৯৯,০৪০	৫.৩৮	০.৫২
১৯৩১-ফেব্রুয়ারি ২৬	৩,৫৬,০৪,১৭০	২৩,৫০,০৭৪	৭.০৭	০.৬৮
১৯৪১-মার্চ ১	৪,১৯,৯৭,২৯৭	৬৩,৯৩,১২৭	১৭.৯৬	১.৬৫
১৯৫১-মার্চ ১	৪,৪১,৬৫,৭৪০	২১,৬৮,৪৪৩	৫.১৬	০.৫০
১৯৬১-ফেব্রুয়ারি ১	৫,৫২,২২,৬৬৩	১,১০,৫৬,৯২৩	২৫.০৪	২.২৩
১৯৭৪-মার্চ ১	৭,৬৩,৯৮,০০০	২,১১,৭৫,৩৩৭	৩৮.৩৫	২.৫০
১৯৮১-মার্চ ৫	৮,৯৯,১২,০০০	১,৩৫,১৪,০০০	১৭.৬৯	২.৩৩
১৯৯১-মার্চ ১১	১১,১৪,৫৫,১৮৫	২,১৫,৪৩,১৮৫	২৩.৯৬	২.১৫
২০০১-জানুয়ারি ২২	১৩,০০,২৯,৭৪৯	১,৮৫,৭৪,৫৬৪	১৬.৬৬	১.৫৪
২০১১-মার্চ (গণনাকৃত)	১৪,২৩,১৯,০০০	১,২২,৪৯,২৫১	৯.৪২	১.৩৪

উৎস। আদমশুমারী রিপোর্ট ২০০১, প্রকাশ জুলাই ২০০৩, পৃ-২৪ এবং আদমশুমারী ২০১১-এর প্রাথমিক গণনাকৃত তথ্য।

বাংলাদেশের জনসংখ্যা পরিস্থিতি

বাংলাদেশে জনসংখ্যা দ্বিগুণ হবার সময়

যে এলাকা নিয়ে বাংলাদেশ গঠিত, সে এলাকায় গত কয়েক শতকের জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং দ্বিগুণ হওয়ার তালিকা নিচে দেয়া হলো। জনসংখ্যাবিদদের সূত্র অনুযায়ী কোন দেশের লোকসংখ্যা শতকরা এক ভাগ বৃদ্ধি পেলে ৭০ বছরে সে দেশের লোকসংখ্যা দ্বিগুণ হয়। এ হিসেবে বাংলাদেশের জনসংখ্যার বর্তমান বৃদ্ধির হার ধরে আগামী ২০১১ সালে সম্ভাব্য প্রক্ষেপিত জনসংখ্যা কত হবে তা তালিকায় দেখানো হলো-

বাংলাদেশের জনসংখ্যা পরিস্থিতি

জনসংখ্যা দ্বিগুণ হবার সময়

সন	লোকসংখ্যা	দ্বিগুণ হওয়ার বছর	বৃদ্ধির মোট সংখ্যা
১৬৫০	১ কোটি	২১১ বছর	১ কোটি
১৮৬১	২ কোটি		
১৯০১	২ কোটি ৮৯ লাখ		
১৯১১	৩ কোটি ১৬ লাখ		২ কোটি ২০ লাখ
১৯২১	৩ কোটি ৩৩ লাখ	৮০ বছর	(দ্বিগুণেরও বেশি)
১৯৩১	৩ কোটি ৫৬ লাখ		
১৯৪১	৪ কোটি ২০ লাখ		
১৯৫১	৪ কোটি ২১ লাখ		
১৯৬১	৫ কোটি ৮ লাখ	৪০ বছর	৪ কোটি ৮০ লাখ
১৯৭১	৭ কোটি ৬৪ লাখ		(দ্বিগুণের বেশি)
১৯৮১	৯ কোটি - লাখ		
১৯৯১	১১ কোটি ১৪ লাখ		
২০০১	১৩ কোটি	৩০ বছর	৫ কোটি ৯৭ লাখ
২০১১	১৪ কোটি ৯৭ লাখ		

বাংলাদেশের জনসংখ্যা পরিস্থিতি

বাংলাদেশে গণনাকৃত এবং সমন্বিত জনসংখ্যা (১৯৭৪-২০১১)

শুমারী সাল	গণনাকৃত জনসংখ্যা (হাজার)	সমন্বিত জনসংখ্যা (হাজার)	সমন্বয়ের হার%
১৯৭৪	৭১৪৭৯	৭৬৩৯৮	+ ৬.৮৮
১৯৮১	৮৭১২০	৮৯৯১২	+ ৩.২০
১৯৯১	১০৬৩১৫	১১১৪৫৫	+ ৪.৮৩
২০০১	১২৪৩৫৫	১৩০৫২৩	+ ৪.৯৬
২০১১	১৪২৩১৯	১৪৯৭৭২	+ ৪.৯৮

উৎস : শুমারী জরিপ ২০১১-এর প্রতিবেদন।

বাংলাদেশের জনসংখ্যা পরিস্থিতি

জনসংখ্যার ঘনত্বঃ

বাংলাদেশে জনসংখ্যার ঘনত্ব বিশ শতকের শুরুতে অনেক কম ছিল। ১৯০১ থেকে ১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত জনসংখ্যা ঘনত্ব বৃদ্ধির হার শতকরা ১০ ভাগের নিচে ছিল। এর পর ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দের দিকে ১৮.২৬ শতাংশে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৫১-তে ৪.৯১ শতাংশে নেমে আসে। এর কারণ ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে দেশ ভাগ হয়ে ভারত এবং পাকিস্তান নামক রাষ্ট্র গঠন। বাংলাদেশ ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে স্বাধীন হবার পর জনসংখ্যা ঘনত্বের বৃদ্ধি ঘটে। জনসংখ্যার বিবর্তনের (Demographic transition) এ পর্যায়ে জন্মহার ও মৃত্যুহার উভয় হ্রাস পায় বলে ঘনত্ব বৃদ্ধির হার যৌক্তিক পর্যায়ে নেমে আসে। নিচের টেবিলে কিগত শতকের জনসংখ্যা ঘনত্বের হার দেখানো হলো।

বাংলাদেশের জনসংখ্যা পরিস্থিতি

জনসংখ্যার ঘনত্ব (প্রতি বর্গকিলোমিটার) ১৯০১-২০১১

শুমারী বছর	ঘনত্ব	পরিবর্তনের শতকরা হার
১৯০১	১৯৬	-
১৯১১	২১৪	৯.১৮
১৯২১	২২৫	৫.১৪
১৯৩১	২৪১	৭.১১
১৯৪১	২৮৫	১৮.২৬
১৯৫১	২৯৯	৪.৯১
১৯৬১	৩৭৪	২৫.০৮
১৯৭৪	৫১৮	৩৮.৫০
১৯৮১	৬০৯	১৭.৫৭
১৯৯১	৭৫৫	২৩.৯৭
২০০১	৮৮১	১৬.৬৯
২০১১	১০১৫	১৫.২১
২০১৭	১১০৩	৮.৬৭ (অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৯)

উৎস : আদমশুমারী ২০০১, আদমশুমারী ২০১১-এর সমন্বিত তথ্য।

বাংলাদেশের জনসংখ্যা পরিস্থিতি

বাংলাদেশের জনসংখ্যাস্ফীতির প্রভাব

বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ দেশ। জনসংখ্যা বিস্ফোরণ বাংলাদেশের সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকে ব্যাহত করছে। বাংলাদেশের এমন কোন ক্ষেত্র নেই, যেখানে জনসংখ্যার বিরূপ প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় না। দেশের সম্পদ ও প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধার দৃষ্টিকোণ থেকে জনসংখ্যা বাংলাদেশের জন্য সম্পদ না হয়ে মারাত্মক সমস্যারূপে বিরাজ করছে। জনসংখ্যাস্ফীতির উল্লেখযোগ্য বিরূপ প্রভাকগুলো সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

বাংলাদেশে বর্তমানে খাদ্য ঘাটতি সমস্যার প্রধান কারণ জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও খাদ্য উৎপাদনের অসামঞ্জস্যতা। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশি বলে, খাদ্য উৎপাদন অধিক হলেও খাদ্য সমস্যা থেকেই যাচ্ছে। বিদেশ থেকে বিপুল পরিমাণ খাদ্য আমদানি করতে বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয়ের দরুণ উন্নয়ন ব্যাহত হয়। জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাবে আবাদী ভূমি অনাবাদী ভূমিতে পরিণত হয়ে মাথাপিছু ভূমি হ্রাস পাচ্ছে। এতে মাথাপিছু খাদ্য উৎপাদন ও খাদ্য প্রাপ্তির সম্ভাবনা ব্যাহত হচ্ছে।

বাংলাদেশের জনসংখ্যা পরিস্থিতি

বাংলাদেশের জনসংখ্যাস্ফীতির প্রভাব

জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাবে বাংলাদেশে নির্ভরশীল জনসংখ্যার হার হ্রাস পাচ্ছে না। জনসংখ্যাতাত্ত্বিক নির্ভরশীলতা (Demographic dependency) বলতে যাদের বয়স ০-১৪ এবং ৬০+ বছরের উর্ধ্বে, তাদেরকে বুঝায়। ২০১০ সালের তথ্যানুযায়ী ০-১৪ বছর ৩৫.৭ শতাংশ এবং ৬.২ শতাংশের বয়স ষাট বছরের উর্ধ্বে। অর্থাৎ ৪১.৯ শতাংশ নির্ভরশীল। অন্যদিকে, জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি না পাওয়ায় বেকারত্ব বৃদ্ধি পেয়ে অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতার হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১০ সালে অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতার হার ছিল ৬৮.৭ শতাংশ। যার অর্থ বাংলাদেশে ৩১.৩ শতাংশ লোকের আয়ের উপর ৬৮.৭ শতাংশ লোক নির্ভরশীল।১০ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রভাবে নির্ভরশীল মানুষের অনুপাত হ্রাস পাচ্ছে। পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্যানুযায়ী নির্ভরশীল মানুষের অনুপাত ৫৪ জন (দৈনিক জনকণ্ঠ: ১৮ জানুয়ারি ২০১৮)।

বাংলাদেশের জনসংখ্যা পরিস্থিতি

বাংলাদেশের জনসংখ্যাস্ফীতির প্রভাব

শিক্ষা মানুষের অন্যতম মৌলিক মানবিক চাহিদা। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে শিক্ষার ভূমিকা অপরিসীম।

দেশের বৃহত্তর জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করার জন্য সর্বস্তরে শিক্ষাকে অগ্রাধিকার ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাবে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি না পাওয়ায় অশিক্ষিতের মোট সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আদমশুমারী ২০১১ এর তথ্যানুযায়ী ৭ বছর বয়সের উপরের জনসংখ্যার ৪৮.২

শতাংশ নিরক্ষর। ২০১৭ এর তথ্যানুযায়ী ২৭.৭ জন নিরক্ষর। যা সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত করছে। শিশু সমতা মানচিত্র প্রতিবেদনের তথ্যানুযায়ী বাংলাদেশের ২৩ শতাংশ শিশু স্কুলের বাইরে রয়েছে।

বাংলাদেশের জনসংখ্যা পরিস্থিতি

বাংলাদেশের জনসংখ্যাস্ফীতির প্রভাব

জনসংখ্যা সমস্যার প্রভাবে অপুষ্টি ও স্বাস্থ্য সমস্যা হ্রাস পাচ্ছে না। বাংলাদেশে যে হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে সে হারে চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য রক্ষার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি না পাওয়ায় সামগ্রিক জনস্বাস্থ্যের অবনতি হচ্ছে। স্বাস্থ্যহীনতা ও পুষ্টিহীনতা দেশের অন্যতম সামাজিক সমস্যা হিসেবে বিরাজ করছে। যার প্রধান কারণ জনসংখ্যাস্ফীতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে খাদ্য ও চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধার অভাব।

জনসংখ্যার তাৎক্ষণিক প্রভাব পড়ে ভূমির উপর। প্রতি বছর বর্ধিত জনসংখ্যার জন্য বাড়ীঘর, রাস্তাঘাট, অফিস-আদালত, শিল্প-কারখানা প্রভৃতি স্থাপন ও উত্তরাধিকার সূত্রে ভূমির ভাগ-বাটোয়ারা হবার কারণে বিপুল পরিমাণ আবাদী ভূমি অনাবাদী ভূমিতে পরিণত হচ্ছে। অন্যদিকে, নদীর ভাঙ্গনে প্রতিবছর আবাদী ভূমি নদীগর্ভে বিলীন হচ্ছে। এতে চাষাবাদযোগ্য ভূমির পরিমাণ দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। ২০০১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৮৮১ জন এবং ২০১১ এর আদমশুমারীর সমন্বিত জনসংখ্যার তথ্যানুযায়ী ১০১৫ জন। ২০১৭ এর তথ্যানুযায়ী ১১০৩ জন। জনসংখ্যার চাপে ভূমিহীন এবং দরিদ্র শ্রেণীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বাংলাদেশের জনসংখ্যা পরিস্থিতি

বাংলাদেশের জনসংখ্যাস্ফীতির প্রভাব

জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধির প্রভাবে জনগণের জীবনযাত্রার মান হ্রাস পাচ্ছে। বর্ধিত জনসংখ্যার মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য বার্ষিক বিপুল পরিমাণ অর্থ অনুৎপাদন খাতে ব্যয় করতে হয়। যা মূলধন গঠন ব্যাহত করে শিল্পায়নের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাবে বাংলাদেশের জনগণের বর্তমান চাহিদা পুরণে বার্ষিক বিপুল অর্থ বিনিয়োগ করতে হয়। সুতরাং জনসংখ্যার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি মূলধন গঠন ও শিল্পায়নের অন্যতম প্রতিবন্ধক।

বাংলাদেশের জনসংখ্যা পরিস্থিতি

বাংলাদেশের জনসংখ্যাস্ফীতির প্রভাব

জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রত্যক্ষ প্রভাব হলো পরিবেশ দূষণ ও প্রাকৃতিক ভারসাম্যহীনতা। বর্ধিত জনসংখ্যার জন্য বাসগৃহ নির্মাণ, রাস্তাঘাট ও পুকুর খনন প্রভৃতি কারণে গাছপালা ও বনাঞ্চল ক্রমান্বয়ে ধ্বংস করা হচ্ছে। খাদ্যসহ অন্যান্য চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ওষুধ ব্যবহারের ফলে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। তদুপরি জনসংখ্যার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পয়ঃপ্রণালী, শৌচাগার ইত্যাদি তৈরি করা সম্ভব হচ্ছে না বলে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে এবং বিভিন্ন রোগজীবাণু বিস্তার লাভ করছে। এছাড়া বর্ধিত জনসংখ্যার যাতায়াত ও যোগাযোগের জন্য ব্যবহৃত যান্ত্রিক যানবাহন, পরিবেশ দূষণে মারাত্মক প্রভাব ফেলছে। জনংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাবে বাংলাদেশের যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থা ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠছে। সড়ক দুর্ঘটনার সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। অতিরিক্ত যানবাহনের প্রভাবে যাতায়াত অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

বাংলাদেশের জনসংখ্যা পরিস্থিতি

বাংলাদেশের জনসংখ্যাস্ফীতির প্রভাব

জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাবে জনসংখ্যার গুণগত ভারসাম্যহীনতা ও সামাজিক বিশৃংখলা দেখা দিচ্ছে। বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার দরিদ্র ও নিম্ন শ্রেণির মধ্যে অধিক। দরিদ্রশ্রেণি তাদের সন্তানদের লেখাপড়াসহ অন্যান্য মৌলিক চাহিদা যথাযথভাবে পূরণে সক্ষম হচ্ছে না। এতে দরিদ্র পরিবারের সন্তানদের সমাজিকীকরণ ব্যাহত হয়ে ব্যক্তিত্ব যথাযথভাবে গড়ে উঠছে না। সমাজে এদের সংখ্যা অধিক। অন্যদিকে, শিক্ষিত ও সম্পদশালী শ্রেণীর মধ্যে সন্তান জন্মদানের হার কম। তারা সন্তানদের উপযুক্ত শিক্ষা ও অন্যান্য মৌল চাহিদা পূরণের মাধ্যমে সুষ্ঠু ব্যক্তিত্ব গঠনে সক্ষম। সমাজে এদের সংখ্যা অত্যন্ত কম। সুতরাং বলা যায়, বাংলাদেশে যে হারে দরিদ্র শ্রেণীর মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং উচ্চ শ্রেণীতে জনসংখ্যা যেভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে, তাতে বাংলাদেশে জনসংখ্যার গুণগত ভারসাম্যহীনতা দেখা দেবে। যা সামাজিক সংহতি ও শৃঙ্খলার প্রতি হুমকি সৃষ্টি করবে। সমাজ জীবনে অশান্তি, হতাশা, ব্যর্থতা ও চরম বিশৃঙ্খলা ক্রমশ বৃদ্ধি পাবে।

বাংলাদেশে চক্রাকারে বিরাজমান দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রের মৌলিক প্রভাবক হলো জনসংখ্যা বৃদ্ধি। জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাবে মাথাপিছু আয় ও জাতীয় আয় হ্রাস পেয়ে দেশ পুনরায় দারিদ্র্যের দিকে প্রত্যাবর্তন করছে। বাংলাদেশের উন্নয়নের প্রতিটি খাতে জনসংখ্যা সমস্যার নেতিবাচক প্রভাব রয়েছে।

বাংলাদেশের জনসংখ্যা পরিস্থিতি

বাংলাদেশের জনসংখ্যা সমস্যা মোকাবেলায় সমাজকর্মীর ভূমিকা

সমাজকর্মীর ভূমিকা বলতে তার পেশাগত অবস্থান এবং মর্যাদার (Position and status) পরিপ্রেক্ষিতে সম্পাদিত দায়িত্ব ও কর্তব্যকে নির্দেশ করে। যেমন হাসপাতাল পরিবেশে নিয়োজিত চিকিৎসা সমাজকর্মী (Medical Social workers) তার পেশাগত অবস্থান ও মর্যাদার পরিপ্রেক্ষিতে যে সব দায়িত্ব পালন করেন, সেগুলো তার ভূমিকা (Role)। আর এসব ভূমিকা পালন করতে গিয়ে যে সব কর্মসম্পাদন করেন সেগুলো হলো তার কার্যাবলী (Functions)। সুতরাং ভূমিকা এবং কার্যাবলী (Role and functions) সম্পর্কযুক্ত হলেও এক নয়।

সমাজকর্ম অনুশীলনের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র (Practice field) হলো জনসংখ্যা সমস্যা। বিশ্বের প্রায় সবদেশেই কোন না কোনভাবে জনসংখ্যা সমস্যা বিদ্যমান। আর জনসংখ্যা সমস্যা বিচ্ছিন্ন কোন সমস্যা নয়। সমাজের অন্যান্য সমস্যার সঙ্গে এটি অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কযুক্ত। বাংলাদেশের মত জনসংখ্যাধিক্য দেশে জনসংখ্যা সমস্যা মোকাবেলায় পেশাদার সমাজকর্মীরা বহুমুখী ভূমিকা পালন করতে পারে।

বাংলাদেশের জনসংখ্যা পরিস্থিতি

বাংলাদেশের জনসংখ্যা সমস্যা মোকাবেলায় সমাজকর্মীর ভূমিকা

জনসংখ্যা সমস্যা মোকাবেলায় বিশ্বব্যাপী পেশাদার সমাজকর্মীর সাধারণ ভূমিকা হলো গবেষকের ভূমিকা। সমাজকর্মীরা অন্যান্য সংশ্লিষ্ট পেশাদার ব্যক্তিদের সঙ্গে সহযোগিতার মাধ্যমে জনসংখ্যা বিষয়ক গবেষণা পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণকারীর ভূমিকা পালন করে থাকেন। জনসংখ্যা সমস্যার প্রভাব, কারণ, সমাধানের উপায়, জনগণের মনোভাব ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণার মাধ্যমে বাস্তব তথ্য সংগ্রহে সমাজকর্মীরা প্রচেষ্টা চালান। এছাড়া জনসংখ্যা সমস্যা মোকাবেলার লক্ষ্যে গৃহীত কার্যাবলীর সফলতা ও ব্যর্থতা মূল্যায়নে গবেষণার বিকল্প নেই। অন্যদিকে, বিভিন্ন গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যাদি ব্যবহার করে সমাজকর্মীরা জনসংখ্যা সমস্যা মোকাবেলায় অবদান রাখতে পারেন।

জনসংখ্যা নীতি প্রণয়নের বিভিন্ন পর্যায়ে সমাজকর্মীরা পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে পারে। বাংলাদেশে জনসংখ্যা সমস্যা মোকাবেলায় তদানীন্তন পাকিস্তান আমলে ১৯৬০ সাল থেকে জনসংখ্যা নীতি প্রণয়নে সমাজকর্মীরা সহায়তা করে আসছে। সমাজকর্মীরা আইন প্রণয়ন কর্তৃপক্ষ, জনপ্রশাসন সংস্থা, তহবিলদাতা প্রতিষ্ঠান, সামাজিক নীতি প্রণয়ন কর্তৃপক্ষসহ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গকে প্রভাবিত করে জনসংখ্যা নীতির উন্নয়ন, সংশোধন এবং পরিবর্তনে অর্থবহ ভূমিকা পালন করতে পারেন।

বাংলাদেশের জনসংখ্যা পরিস্থিতি

বাংলাদেশের জনসংখ্যা সমস্যা মোকাবেলায় সমাজকর্মীর ভূমিকা

প্রজনন আচরণ পরিবর্তনের এজেন্ট হিসেবে সমাজকর্মীরা ভূমিকা পালন করতে পারেন। জনসংখ্যা সমস্যা মোকাবেলার আদর্শ ও পরীক্ষিত কর্মসূচি হলো পরিবার পরিকল্পনা। প্রজনন আচরণ পরিবর্তন ব্যতীত পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি সফল হতে পারে না। সমাজকর্মী পেশাগত জ্ঞান, নীতি ও কৌশল প্রয়োগ করে জনসংখ্যা সমস্যা মোকাবেলার স্বপক্ষে যোগাযোগের মাধ্যমে পরিকল্পিত উপায়ে প্রজনন আচরণ পরিবর্তনে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। পরিবর্তনের বাহক (Change agent) হিসেবে সমাজকর্মীরা ব্যক্তি, দল ও জনসমষ্টির সাথে জনসংখ্যা সমস্যা মোকাবেলায় কাজ করতে পারেন।

সমাজকর্মের অন্যতম কৌশল হলো উদ্বুদ্ধকরণ (Motivation)। সমাজকর্মী উদ্বুদ্ধকরণকারী (Motivator) হিসেবে সন্তান প্রজননে সক্ষম দম্পতি এবং যুব সমাজকে অধিক জনসংখ্যার নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে জ্ঞানদানের মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ করতে পারেন। উদ্বুদ্ধ করণ ছাড়া জন্মনিয়ন্ত্রণ বিষয়ে প্রেষণা সৃষ্টি করা সর্বক্ষেত্রে সম্ভব নয়।

বাংলাদেশের জনসংখ্যা পরিস্থিতি

বাংলাদেশের জনসংখ্যা সমস্যা মোকাবেলায় সমাজকর্মীর ভূমিকা

সমাজকর্মীরা পরিবার পরিকল্পনায় নিয়োজিত মাঠকর্মীদের প্রশিক্ষক হিসেবে ভূমিকা পালন করতে পারেন। বাংলাদেশে জনসংখ্যা সমস্যা মোকাবেলায় পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে পরিবার কল্যাণ সহকারীগণ হলেন "Front-line female workers" এবং তাদের দায়িত্ব পালনের গুরুত্ব অপরিসীম। সমাজকর্মীরা পেশাদার সমাজকর্মের পদ্ধতি ও নীতিসমূহের আলোকে প্রশিক্ষণ দানের মাধ্যমে মাঠকর্মীদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করতে পারেন। যেমন সাক্ষাৎকার গ্রহণ, তথ্য সংগ্রহ, কেস রেকর্ডিং, অনুসরণ, উদ্বুদ্ধকরণ, তত্ত্বাবধান ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিতে পারেন। তৃণমূল পর্যায়ে নিয়োজিত পরিবার পরিকল্পনা কর্মীদের প্রশিক্ষণ তাদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির সহায়ক।

জনসংখ্যা সমস্যাকে বিচ্ছিন্নভাবে না দেখে সমাজ ও পরিবারের সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে সমাজকর্মীরা প্রত্যক্ষণ করে। সমাজকর্মীরা বহুমুখী কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে জনসংখ্যা সমস্যা মোকাবেলায় সচেষ্ট। জন্ম নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির সঙ্গে কর্মসংস্থান, সামাজিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও জনস্বাস্থ্যসেবা, শিশু ও মাতৃকল্যাণ, সামাজিক নিরাপত্তা, মহিলাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, নারী ক্ষমতায়ন, লিঙ্গ বৈষম্য হ্রাস ইত্যাদি বহুমুখী সমন্বিত কর্মসূচি প্রণয়নের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। কর্মসূচি প্রণেতা হিসেবে সমাজকর্মীরা প্রজনন স্বাস্থ্য ও প্রজনন আচরণ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির প্রতি অধিক গুরুত্বারোপ করেন।

বাংলাদেশের জনসংখ্যা সমস্যা মোকাবেলায় সমাজকর্মীর ভূমিকা

বাংলাদেশে জনসংখ্যা সমস্যা মোকাবেলার লক্ষ্যে ১৯৫৪ সাল থেকে সরকারি বেসরকারি পর্যায়ে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি হিসেবে সমাজকর্মীরা জনসংখ্যা সমস্যা মোকাবেলায় গবেষণাকারী, জনসংখ্যানীতি প্রণয়নের প্রভাব বিস্তারকারী, কর্মসূচি প্রণয়নকারী, তত্ত্বাবধায়ক, প্রশাসক, সংগঠক, প্রশিক্ষক ইত্যাদি ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজকর্ম ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৩ – সামাজিক সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মের অনুশীলন

টপিক – ০৪ বেকারত্ব

টপিক ০৪: বেকারত্ব

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

বেকারত্ব

বেকারত্ব বিশ্বব্যাপী এক সর্বজনীন সাধারণ সমস্যা। শিল্পোন্নত অথবা অনুন্নত সবদেশেই দারিদ্র্য ও বেকারত্ব বিরাজমান। বেকারত্ব কোন দেশ বা অঞ্চলের সমস্যা নয়; বরং বিশ্বব্যাপী এক মানবিক, আর্থিক ও সামাজিক সমস্যা। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (International Labour Organization-ILO) কর্মসংস্থান বিষয়ক বার্ষিক প্রতিবেদনের তথ্যানুযায়ী ২০১২ সালে বিশ্ব বেকারের সংখ্যা ছিল ১৯ কোটি ৭০ লাখ। ২০১৩ সালে এ সংখ্যা ২০ কোটি ২০ লাখে পৌঁছাবে বলে আইএলও প্রক্ষপন করছে। ২০১৭ সালে বিশ্বব্যাপী বেকারের সংখ্যা ২১ কোটি ছয় লাখে উন্নীত হতে পারে বলে আইএলও আশংকা করছে। জনসংখ্যা অধ্যুষিত বাংলাদেশের মতো স্বল্প উন্নত দেশে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের অন্যতম প্রতিবন্ধক হলো বেকারত্ব। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা প্রকাশিত ওয়ার্ল্ড এমপ্লয়মেন্ট এন্ড সোশ্যাল আউটলুক ২০১৮ তথ্যানুযায়ী বাংলাদেশে ২০১৩ সাল থেকে বেকারত্বের হার ছিল ৪.৪ শতাংশ। বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে বেকারের সংখ্যাও বাড়ছে।

বেকারত্ব

বেকারত্বের ধারণা

সাধারণ অর্থে কর্মহীন অবস্থাকে বেকারত্ব বলা হয়। কিন্তু অনেক সময় ইচ্ছাকৃতভাবেও অনেকে কর্মহীন থাকতে পারে। এরূপ ইচ্ছাকৃত কর্মহীনদের অর্থনীতিতে বেকারত্ব ধরা হয় না। আবার শারীরিক বা মানসিকভাবে কাজ করতে অক্ষম কর্মহীনদের যেমন- শিশু, বৃদ্ধ, বিকলাঙ্গদের বেকার বলা যায় না। অর্থনীতি এবং সামাজিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ হতে বেকারত্ব বলতে, এমন একটি অবস্থাকে বুঝায়, যাতে কর্মক্ষম শ্রমিক বর্তমান মজুরিতে কর্মে ইচ্ছুক থাকা সত্ত্বেও কর্মে নিয়োগ লাভে সক্ষম হয় না। কর্মক্ষম শ্রমিকের অনিচ্ছাকৃত কর্মহীনতাকে অর্থনীতিতে বেকারত্ব বলা হয়। সমাজকর্ম অভিধানের (১৯৯৫) সংজ্ঞানুযায়ী, “বেকারত্ব হলো এমন কর্মহীন অবস্থা, যে অবস্থার প্রভাবে কর্মক্ষম ব্যক্তি নিজের প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক চাহিদা স্বাধীনভাবে পূরণের মতো উপার্জন করতে অক্ষম হয়।"(Unemployment is the condition of being without a job and the resulting income that is necessary to meet economic needs independently.)

প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক পিগুর (AC Pigu) মতে, "যখন কর্মক্ষম লোকেরা যোগ্যতা অনুসারে, প্রচলিত মজুরির ভিত্তিতে কাজ করতে চায় অথচ কাজ না পাওয়ায়, তখন যে অবস্থার উদ্ভব হয়, সে অবস্থাকে বেকারত্ব বলা হয়।"

বেকারত্ব

বেকারত্বের ধারণা

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (International Labour Organization-ILO) বেকারত্ব এবং অর্ধবেকারত্বের কার্যকরী সংজ্ঞা প্রদান করেছে। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা'র (আইএলও) সংজ্ঞানুযায়ী, বেকার বলতে সে ব্যক্তিতে বোঝায়, যিনি অব্যবহিত পূর্ববর্তী সপ্তাহে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কোন কাজ এমনকি এক ঘন্টাও কাজে নিয়োজিত ছিলেন না। আবার যিনি ১৫ ঘণ্টার কম পারিবারিক প্রতিষ্ঠানে বিনা পারিশ্রমিকে (Unpaid family worker) কাজে নিযুক্ত ছিলেন, তাকেও বেকার বলা হয়। আবার নির্দেশিত সপ্তাহে যে ব্যক্তি ৩৫ ঘণ্টার কম কর্মে নিয়োজিত ছিল তাকেও বেকার হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো আইএলও প্রণীত বেকারের সংজ্ঞা অনুসরণ করে।

উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলো হতে কাজ করার ক্ষমতা বা যোগ্যতা, প্রচলিত মজুরিতে কাজ করার ইচ্ছা এবং কাজের অনুপস্থিতি বেকারত্বের তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়ে উঠে।

বেকারত্ব

বেকারত্বের ধারণা

কারণ ও প্রকৃতি অনুযায়ী বেকারত্ব বিভিন্ন ধরনের হয়। যেমন-

মওসুমী বেকার (Seasonal Unemployment) : ঋতু পরিবর্তনের ফলে যে বেকারত্বের সৃষ্টি হয়, তাকে মওসুমী বেকারত্ব বলা হয়।

• প্রযুক্তিবিদ্যাজনিত বেকার (Technological Unemployment) : উৎপাদনের কলা-কৌশলগত পরিবর্তনের ফলে যে বেকারত্বের সৃষ্টি হয়, তাকে প্রযুক্তিবিদ্যাজনিত বেকারত্ব বলা হয়।

• ছদ্মবেশী বা প্রচ্ছন্ন বেকার (Disguised or under Unemployment) : শ্রমিক যদি কাজে তার দক্ষতার পরিপূর্ণ ব্যবহার করতে না পারে, তবে তাকে প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব বলে।

• বাণিজ্যচক্রজনিত বেকার (Cyclical Unemployment) : বাণিজ্যের উঠানামার প্রভাবে যে বেকারত্বের সৃষ্টি হয়, তাকে বাণিজ্য চক্রজনিত বেকারত্ব বলা হয়।

• আকস্মিক বেকার (Causal Unemployment) : প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণেও অনেক সময় বেকারত্ব দেখা দিতে পারে। এরূপ বেকারত্বকে আকস্মিক বেকারত্ব বলা হয়।

বেকারত্ব

বেকারত্বের ধারণা

অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ হতে বেকার সমস্যার প্রধান কারণ মূলধনের অভাব। মূলধনের অভাবে অনুন্নত দেশে প্রাকৃতিক সম্পদ কাজে লাগিয়ে উৎপাদন ও নিয়োগ বৃদ্ধি করা যায় না। ফলে শ্রমের বিপুল অপচয় ঘটে এবং বেকারত্ব দেখা দেয়। জনসংখ্যাবহুল অনুন্নত ও দরিদ্র দেশে মূলধন গঠনের হার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের চেয়ে কম। উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধনের অভাবে, দেশের জনশক্তিকে কাজে লাগানো যায় না, যার প্রভাবে বেকার সমস্যা দেখা দেয়। বাংলাদেশের বেকার সমস্যা মূলধনের অভাবজনিত কারণে সৃষ্ট। মূলধন এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির সামঞ্জস্যহীনতা বাংলাদেশে বেকারত্বের প্রধান কারণ।

বাংলাদেশে বিরাজমান বেকার সমস্যার অন্যতম প্রধান কারণ হলো জনসংখ্যা বৃদ্ধি। জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাবে বাংলাদেশে যে হারে শ্রমশক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে সে হারে বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান না হবার প্রভাবে বেকারত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১০ সালের শ্রমশক্তি জরিপের তথ্যানুযায়ী ৫৬.৭ মিলিয়ন শ্রমশক্তির মধ্যে ২.৬ মিলিয়ন বেকার। বেকারের শতকরা হার ছিল ৪.৫ ভাগ। শ্রমশক্তি জরিপ ২০১৬-১৭ অনুযায়ী ১৫ বছরের উর্ধ্বে অর্থনৈতিকভাবে কর্মক্ষম শ্রমশক্তি ৬.৩৫ কোটি। এর মধ্যে ০.২৭ কোটি বেকার।

বেকারত্ব

বেকারত্বের ধারণা

শ্রমশক্তি পরিসংখ্যান হতে দেখা যায় বাংলাদেশে ১৯৯৫-৯৬ সালে (১৫ বছর +) শ্রমশক্তি ছিল ৩৬.১ মিলিয়ন। তা ২০১০ এর শ্রমশক্তি জরিপের তথ্যানুযায়ী ৫৬.৭ মিলিয়নে পৌঁছে। অর্থাৎ চৌদ্দ বছরে ২০.৬ মিলিয়ন শ্রমশক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে। বেকারত্বের হার ৩.৫ থেকে ৪.৫-এ পৌঁছেছে। এ সময় নারী শ্রমশক্তি অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পেয়ে ৫.৪ মিলিয়ন থেকে ১৭.২ মিলিয়নে পৌছে। ২০১৬-১৭ শ্রমশক্তি জরিপ অনুযায়ী ২০১০ সালের চেয়ে ৬৮ লাখ শ্রমশক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার তথ্যানুযায়ী দেশে ২০১৩ সাল থেকে বেকারত্বের হার ৪.৪ শতাংশ। সুতরাং বলা যায় বাংলাদেশে বেকার সমস্যার অন্যতম প্রধান কারণ জনসংখ্যা বৃদ্ধি।

আবাদী ভূমির পরিমাণ হ্রাস বেকারত্বের অন্যতম কারণ। বাংলাদেশে কর্মসংস্থানের প্রধান খাত হলো কৃষি। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, রাস্তাঘাট উন্নয়ন, গৃহায়ন, নদীর ভাঙ্গন এবং শহরায়ন ও শিল্পায়নের প্রসার প্রভৃতি কারণে আবাদী ভূমি হ্রাস পাওয়ায় কৃষি খাতে কর্মসংস্থানের হার হ্রাস পাচ্ছে। ১৯৭৪ সালে কৃষিতে কর্মসংস্থানের হার ছিল ৭৮.৬ শতাংশ। ২০১০ এর শ্রমশক্তি জরিপের তথ্যানুযায়ী ৪৭.৩ ভাগ এবং ২০১৬-১৭জরিপ অনুযায়ী ৪০.৬১ ভাগ কৃষিতে নিয়োজিত। ক্রমবর্ধমান শ্রমশক্তির কৃষিতে কর্মসংস্থান না হওয়ায় বেকার সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বেকারত্ব

বেকারত্বের ধারণা

বাস্তবসম্মত শ্রম ও কর্মসংস্থান নীতি এবং জনশক্তি পরিকল্পনার অভাব বাংলাদেশে বেকারত্বের কারণগুলোর মধ্যে অন্যতম। ভবিষ্যত জনশক্তির চাহিদা এবং সরবরাহের জন্য কি ধরনের কার্যক্রম নেয়া প্রয়োজন, সেসব বিষয়ে জনশক্তি পরিকল্পনায় সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। খাতভিত্তিক জনশক্তির চাহিদা এবং সরবরাহের লক্ষ্যে জনশক্তি নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। ভবিষ্যত বেকারত্ব রোধে জনশক্তি নীতি ও পরিকল্পনার গুরুত্ব অপরিসীম।

বাংলাদেশে শিক্ষিত বেকারের অন্যতম প্রধান কারণ চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন শিক্ষা ব্যবস্থা। শিক্ষা এবং কর্মসংস্থান পরস্পর সম্পর্কিত। বাংলাদেশে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা, শিক্ষিত বেকার সৃষ্টির জন্য অনেকাংশে দায়ী। এতে সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশের অর্থনীতি কৃষিনির্ভর হলেও প্রচলিত শিক্ষা বাস্তবে কৃষিনির্ভর অর্থনীতির উপযোগী জনশক্তি তৈরি করতে তেমন ভূমিকা রাখতে পারেছে না। কৃষিনির্ভর অর্থনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শিক্ষার্থীর দক্ষতা ও মানসিকতা গড়ে উঠছে না। নিরক্ষর কৃষকের সন্তান শিক্ষা লাভের পর কৃষির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হবার মানসিকতা হারিয়ে ফেলে। কৃষি অর্থনীতির উপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থার অভাবে শিক্ষিত বেকারের হার বাড়ছে।

বেকারত্ব

বেকারত্বের ধারণা

বাংলাদেশে উচ্চ শিক্ষার্থীদের মধ্যে কর্ম প্রত্যাশীর চিত্র বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের নিচের তথ্যাদি হতে স্পষ্ট হয়ে উঠে।

বিসিএস	শূন্যপদ	পদে নিয়োগ প্রত্যাশী	প্রতি শূন্য পদের বিপরীতে প্রার্থী
৩০ তম	২৩৬৭	১৪৭৯৮৮	৬২.৫২ জন
৩১ তম	২০৭২	১৬৪৪১৬৭	৭৯.২৩ জন
৩৩ তম	৪২০৬	১৯৩০৫৯	৪৫.৯০ জন
৩৪ তম (২০১৩)	২০৫২	২২১৫৭৫	১০৭.৯৮

৪০ তম বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষার জন্য চার লাখ ১০ হাজার ৯৬৩ জন নিবন্ধন করে। শূন্যপদ মাত্র ১৯০৩টি

বেকারত্ব

বেকারত্বের ধারণা

বাংলাদেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা বেকারত্বের অন্যতম প্রধান কারণ। বাংলাদেশে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতিবন্ধক হলো রাজনৈতিক অস্থিরতা। যে কোন দেশের উন্নত আর্থ-সামাজিক কাঠামো গঠনের পূর্বশর্ত হচ্ছে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা। রাজনৈতিক অস্থিরতার প্রভাবে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক কাঠামো সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। রাজনৈতিক অস্থিরতার প্রভাবে দেশি বিদেশি বিনিয়োগ প্রত্যাশা অনুযায়ী বৃদ্ধি পাচ্ছে না। যার ফলে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগও প্রত্যাশা অনুযায়ী তৈরি হচ্ছে না।

বাংলাদেশে বেকার সমস্যার কারণগুলোর মধ্যে কারিগরি জ্ঞান ও দক্ষতার অভাব অন্যতম। কারিগরি জ্ঞান ও দক্ষতার অভাব, বেকারত্ব প্রসারের সহায়ক। দেশে এবং বিদেশের শ্রমবাজারে দক্ষ শ্রমশক্তির চাহিদা বৃদ্ধি পেলেও দক্ষ শ্রমশক্তির যোগান দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর শ্রমশক্তি জরিপ ২০১০ এর তথ্যানুযায়ী দেশের ১৫ বছরের উর্ধ্বের জনসংখ্যার ৯৫.৫ শতাংশ কোন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেনি। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে মাত্র ১.৬ শতাংশ।

বেকারত্ব

বেকারত্বের ধারণা

বাংলাদেশে শ্রমশক্তি নিয়োগের বৃহত্তম সংগঠিত খাত হলো শিল্পখাত। ব্যাপক বেসরকারিকরণ ও বেসরকারি খাতে শিল্পস্থাপনে বিনিয়োগের সুযোগ সুবিধা দেয়া সত্ত্বেও দেশি বিদেশি বিনিয়োগ প্রত্যাশা অনুযায়ী হচ্ছে না। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে সৃষ্ট হরতাল, ধর্মঘট, শ্রমিক সংগঠনের কর্মতৎপরতা, নিরাপত্তাহীনতা প্রভৃতি কারণে শিল্পায়ন ব্যাহত হচ্ছে। যার প্রভাবে বেসরকারি খাতে কর্মসংস্থান তেমন বৃদ্ধি পায়নি।

নারীদের কর্মসংস্থানের অভাব বেকারত্ব প্রসারের সহায়ক। সামাজিক মূল্যবোধ, অশিক্ষা, অজ্ঞতা, কর্মসংস্থানের অভাব প্রভৃতি কারণে জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী সরাসরি উৎপাদন কর্মে অংশ গ্রহণ করতে পারছে না। এটি বাংলাদেশে বেকার সংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ।

বেকারত্ব

বেকারত্বের ধারণা

বাংলাদেশে বেকার সংখ্যা হ্রাসে বিদেশে কর্মসংস্থানের গুরুত্ব অপরিসীম। শিক্ষা, আর্থিক অসংগতি, দক্ষতা এবং উন্নত যাতায়াত ব্যবস্থার অভাবে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শ্রমের স্থানান্তর প্রত্যাশা অনুযায়ী হচ্ছে না। প্রশাসনিক জটিলতা, দীর্ঘসূত্রীতা এবং প্রতারণা, দুর্নীতির কারণে বিদেশে শ্রমশক্তি নিয়োগের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও নিয়োগ প্রত্যাশা অনুযায়ী বৃদ্ধি পাচ্ছে না। পরিশেষে বলা যায় সীমিত আবাদযোগ্য ভূমি, জনসংখ্যার ঘনত্ব, প্রচলিত সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থা, শিল্পায়নের মন্থর গতি ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির নিম্নহারের প্রেক্ষাপটে অব্যাহত শ্রমশক্তি বৃদ্ধির হার, বাংলাদেশে বেকারত্ব-অর্ধবেকারত্ব বৃদ্ধি করছে।

বেকারত্ব

বাংলাদেশের বেকার পরিস্থিতি

বাংলাদেশে বিভিন্ন বিষয়ের পরিসংখ্যানের মধ্যে কর্মসংস্থান পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা কঠিন এবং কম নির্ভরযোগ্য। এর প্রধান কারণ অসংগঠিত খাতের (কৃষি, বাণিজ্য, আত্মকর্মসংস্থান) কর্মসংস্থান, সংগঠিত (আনুষ্ঠানিক নিয়োগ, শিল্প, চাকুরি) খাতের চেয়ে অনেক বেশি। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (BBS) পরিচালিত শ্রমশক্তি জরিপ (Labour Force Survey-LFS) শ্রমশক্তি ও বেকারত্বের সার্বিক তথ্যের উৎস। শ্রমশক্তির এবং বেকারত্বের সার্বিক চিত্র নিরূপণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ১৯৮০ সাল থেকে শ্রমশক্তি জরিপ (Labour Force Survey-LFS) পরিচালনা করে আসছে। ২০১৬-১৭ সালের শ্রমশক্তি জরিপটি এ সিরিজের সর্বশেষ হালনাগাদ জরিপ।

শ্রমশক্তি জরিপ ২০১০ এর তথ্যানুযায়ী বেকারত্বের হার ৪.৫ শতাংশ; যা ২০০৫-০৬ সালে ছিল ৪.৩ শতাংশ। মোট বেকারের সংখ্যা ২০০৫-৬ সালের ২১ লাখ চার হাজার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১০ সালে ২৫ লাখ ৬৮ হাজারে পৌঁছে। ২০১০ সালে পুরুষ শ্রমশক্তির শতকরা ৪.১ ভাগ এবং নারীর ৫.৭ ভাগ বেকার ছিল। নিচের সারণীতে বাংলাদেশে বেকারত্বের প্রবণতা দেখানো হলো। ২০১৬-১৭ শ্রমশক্তি জরিপের তথ্যানুযায়ী বেকারের হার ৪.২ এর মধ্যে পুরুষ ৩.১ নারী ৬.৭ শতাংশ।

বেকারত্ব

বাংলাদেশের বেকার পরিস্থিতি

বেকারত্বের হার (%)

(Unemployment Rate)

জরিপের সন	১৯৯৫-৯৬	১৯৯৯-২০০০	২০০২-২০০৩	২০০৫-০৬	২০১০	২০১৭
উভয়লিঙ্গ	৩.৫	৪.৩	৪.৩	৪.৩	৪.৫	৪.২
পুরুষ	২.৮	৩.৪	৪.২	৩.৪	৪.১	৩.১
মহিলা	৭.৮	৭.৮	৪.৯	৭.০	৫.৭	৬.৭

উৎস : পরিসংখ্যান পকেট বুক ২০০৪ এবং ২০১১, শ্রমশক্তি জরিপ ২০১৬-১৭

বেকারত্ব

বাংলাদেশের বেকার পরিস্থিতি

আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থা আইএলও-র সংজ্ঞা ও বাংলাদেশের বেকারত্ব পরিস্থিতি: আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার সংজ্ঞানুযায়ী বিনা পারিশ্রমিকে ১৫ ঘণ্টার কম পারিবারিক কাজে নিয়োজিত (Unpaid family workers) শ্রমশক্তিকে বেকারের অন্তর্ভুক্ত ধরলে বাংলাদেশে বেকারের শতকরা হার ১৪.১৬ শতাংশে দাঁড়ায়। পুরুষের মধ্যে ৬.৬৩ ভাগ এবং নারীদের ৩১.৪৯ ভাগ। সপ্তাহে ১৫ ঘন্টার কম কর্মে নিয়োজিত মজুরীবিহীন পারিবারিক কাজে নিয়োজিতদের বেকার ধরলে বাংলাদেশে মোট ৮০ লাখ ২৫ হাজার বেকার রয়েছে। মজুরীবিহীন পারিবারিক কাজে নিয়োজিত বেকারের সংখ্যা (১৫ ঘন্টার কম কর্মে নিয়োজিত) ৫৪ লাখ ৫৮ হাজার। এর মধ্যে পুরুষ ১০ লাখ ২২ হাজার এবং মহিলা ৪৪ লাখ ৩৬ হাজার।' আইএলও তথ্যানুযায়ী ২০১৬ তে বাংলাদেশে ৪.৪ শতাংশ বেকার ছিল এসময় মোট সংখ্যা ছিল ২৮ লাখ। তা ২০১৯ সাথে ৩০ লাখে পৌছে।

বেকারত্ব

বাংলাদেশের অর্ধবেকার পরিস্থিতি

বাংলাদেশে অর্ধবেকারের হার বেশি। বিশেষ করে মহিলা শ্রমশক্তির মধ্যে এ হার অত্যন্ত বেশি। ৩৫ ঘণ্টার কম কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিকে আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থা (ILO) অর্ধবেকার হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেছে। ২০১০ সালের শ্রমশক্তি জরিপের তথ্যানুযায়ী কর্মে নিয়োজিত ৫ কোটি ৪০ লাখ ৮৪ হাজার শ্রমশক্তির মধ্যে ১ কোটি ৯ লাখ ৮৬ হাজার অর্ধবেকার। কর্মে নিয়োজিত পুরুষ শ্রমশক্তির ১৪.৪০ ভাগ এবং নারী শ্রমশক্তির ৩৪.১৫ ভাগ অর্ধবেকার। অন্যদিকে শহর ও গ্রামে অর্ধবেকারের হারের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। শহরে অর্ধবেকারের হার ১২.৪০ শতাংশ, গ্রামে ২২.৬৭ শতাংশ। ২০১৬-১৭ শ্রমশক্তি জরিপের তথ্যানুযায়ী মোট কর্মে নিয়োজিতদের ২.৪ শতাংশ অর্ধ বেকার (যাদের মোট সংখ্যা ১.৫ মিলিয়ন। পুরুষ মিলিয়ে অর্ধবেকার।)

বেকারত্ব

শিক্ষিত বেকার পরিস্থিতি

বাংলাদেশে বেকার সমস্যার গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো শিক্ষিত বেকারত্ব। বিপুল সংখ্যক শিক্ষিত বেকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। ২০১০ সালের শ্রমশক্তি জরিপের তথ্যানুযায়ী বাংলাদেশে ৩ কোটি ৩৯ লাখ ৮৭ হাজার শিক্ষিত শ্রমশক্তির মধ্যে ১৯ লাখ ৫১ হাজার বেকার। দেশে ১২ লাখ ৪৭ হাজার পুরুষ এবং ৭ লাখ ৩ হাজার মহিলা শিক্ষিত বেকার রয়েছে। বাংলাদেশে শিক্ষিত বেকারের হার শতকরা ৫.৭৪ ভাগ। পুরুষ শিক্ষিত বেকারের হার ৫.২০ এবং মহিলা শিক্ষিত বেকারের হার ৭.০২ ভাগ। ২০১৬-১৭শ্রমশক্তি জরিপের তথ্যানুযায়ী শিক্ষিত বেকারের হার ৫.৩ শতাংশ। মহিলা শিক্ষিত বেকারের হার ১২.২ শতাংশ।

বেকারত্ব

শিক্ষিত বেকার পরিস্থিতি

বাংলাদেশে বেকারত্বের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হলো মহিলা শ্রমশক্তি বেকারত্বের আধিক্য। ২০১০ সালের জরিপের তথ্যানুযায়ী ৫৬.৭ মিলিয়ন শ্রমশক্তির মধ্যে ১৭.২ মিলিয়ন মহিলা; যার মধ্যে এক মিলিয়ন বেকার। ২০১৬-১৭ শ্রম শক্তি জরিপের তথ্যানুযায়ী ২০ মিলিয়ন মহিলা শ্রমশক্তির মধ্যে ১.৩ মিলিয়ন বেকার। মহিলা বেকারের হার ৬.৭ শতাংশ। মজুরীবিহীন পারিবারিক সাহায্যকারীদের (Unpaid family helpers) মহিলা শ্রমশক্তি অন্তর্ভুক্ত ধরলে মহিলা বেকারের হার ৩১.৪৯ শতাংশ। অন্যদিকে শিক্ষিত মহিলা বেকারের হার ৭.০২ ভাগ।

বেকারত্ব

বেকার যুব শ্রমশক্তি

শ্রমশক্তি জরিপ ২০১০ এর তথ্যানুযায়ী বাংলাদেশে ১৫-২৯ বছর বয়সের মধ্যে যুব জনসংখ্যা হলো তিন কোটি ৯২ লাখ ৫৩ হাজার। যুব শ্রমশক্তির ৯২.৫৪ শতাংশ কর্মে নিয়োজিত এবং ৭.৪৬ শতাংশ বেকার। বাংলাদেশে দুই কোটি নয় লাখ যুব শ্রমশক্তির মধ্যে ১৫ লাখ ৫৮ হাজার বেকার। বিপুল সংখ্যক যুব শ্রমশক্তি বেকার থাকায় আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে। ২০১৬-১৭ শ্রমশক্তি জরিপের তথ্যানুযায়ী ১৫-২৯ বছর বয়সের যুব শ্রমশক্তি দুই কোটি ৮৩ হাজার। যা মোট শ্রমশক্তির ৩৩.৫ শতাংশ। মহিলা যুব শ্রমশক্তি সাত মিলিন বাংলাদেশে মোট বেকারের মধ্যে যুব শ্রম শক্তি বেকার হলো ৭৯.৬ শতাংশ। মোট যুব শ্রমশক্তির মধ্যে ১০.৬ শতাংশ বেকার। কর্মে নিয়োজিত ২৯.৫ শতাংশ হলো যুব শ্রমশক্তি। মোট বেকার যুব শক্তির ৬৩.৭শতাংশ হলো মাধ্যমিক শ্রমশক্তি জরিপ থেকে স্নাতক পাস অর্থাৎ শিক্ষিত যুবশক্তি।

বেকারত্ব

বেকারত্বের প্রভাব

দারিদ্র্যের মতো বেকারত্ব বাংলাদেশের অন্যতম সামাজিক সমস্যা। বেকারত্ব পরিকল্পিত অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের প্রধান অন্তরায়। বেকার সমস্যার বিরূপ প্রভাব অত্যন্ত ব্যাপক, সুদূরপ্রসারী এবং দীর্ঘস্থায়ী। এটি একাধারে সামাজিক ও ব্যক্তিগত সমস্যা। বেকারত্বের প্রভাবে ব্যক্তির আত্মসম্মানবোধ, দায়িত্ববোধ ও মর্যাদাবোধ লোপ পায়। একজন বেকার ব্যক্তিগত সামঞ্জস্যহীনতার (Personal Disorganisation) শিকার হয়ে আত্ম-মর্যাদাহীন এবং প্রতিনিয়ত হতাশা ও ব্যর্থতার সম্মুখীন হয়। শিক্ষাজীবন শেষে সামর্থ্য ও প্রত্যাশা অনুযায়ী কর্মসংস্থানের সুযোগ না থাকায় বেকার হতে হয়। বেকারত্ব শিক্ষিত ব্যক্তির আত্মসম্মানবোধ, দায়িত্ববোধ, জীবনবোধ ইত্যাদি মানবিক গুণাবলী ধ্বংস করে দেয়।

বেকারত্বের প্রভাবে সমাজে অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পায়। বেকারত্ব সৎ ও ন্যায়-নীতিপরায়ন ব্যক্তিকে দুর্নীতিপরায়ন, দায়িত্ববান এবং মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিকে দায়িত্বহীন ও মর্যাদাহীন ব্যক্তিতে পরিণত করে। বেকারত্বের প্রভাবে অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতার মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে উঠে।

২০১০ সালের শ্রমশক্তি জরিপের তথ্যানুযায়ী বাংলাদেশে অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতার হার ৬৮.৭ শতাংশ। শহরে ৭৪.৫ শতাংশ এবং গ্রামে ৬৭.০ শতাংশ। বেকারত্বের প্রত্যক্ষ প্রভাব হলো অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা। ২০১৬-১৭ শ্রমশক্তি জরিপের তথ্যানুযায়ী নির্ভরশীলতার অনুপাত খুব নির্ভরশীলতার অনুপাত ৫১.৭ প্রবীন ৭.৮ এবং যৌথ নির্ভরশীলতার অনুপাত শহরে ৫১.৫ এবং গ্রামে ৬২.৯ শতাংশ।

বেকারত্ব

বেকারত্বের প্রভাব

বেকারত্ব শুধু ব্যক্তির জীবনে অসংগতি সৃষ্টি করে না; এটি পারিবারিক জীবনেও বিশৃংখলা বয়ে আনে। উপার্জনক্ষম সদস্য যদি বেকার হয়ে পড়ে তাহলে পরিবারের নির্ভরশীল সদস্যরা অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হয়। বেকারত্বের প্রভাবে পরিবারের সঞ্চয় ক্ষমতা হ্রাস, সঞ্চিত অর্থ-সম্পদ মৌলিক চাহিদা পূরণে ব্যয়, মূল্যবান সম্পদ বিক্রয় বা বন্ধক, ঋণগ্রস্ততা প্রভৃতি সমস্যা মোকাবেলা করতে হয়। বেকারত্ব পরিবারের সদস্যদের অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলে দেয়। অনেক সময় বেকারত্ব পরিবারের সদস্যদের পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ভাঙ্গন ধরায় এবং পারিবারিক আদর্শ ও মূল্যবোধ ধ্বংস করে। এছাড়া পারিবারিক ভাঙ্গন, বিবাহ বিচ্ছেদ, যৌতুক প্রথা, নারী নির্যাতন ইত্যাদি নেতিবাচক অবস্থা বৃদ্ধিতে বেকারত্বের প্রত্যক্ষ প্রভাব রয়েছে।

বেকারত্ব নিয়ন্ত্রণ বা প্রতিরোধ করা না হলে এটি সামাজিক বিশৃংখলার (Social disorganisation) কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বেকারত্বের প্রভাবে জনগণ সমাজ নির্ধারিত জীবনমান বজায় রাখতে পারে না। এমতাবস্থায় অনেকে জীবনধারণের অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হয়ে সমাজবিরোধী আচরণে জড়িয়ে পড়ে। বেকারত্বের প্রভাবে সমাজে ভিক্ষাবৃত্তি, অপরাধ প্রবণতা, নেশাগ্রস্ততা, জুয়া, যৌতুক প্রবণতা ইত্যাদি সমস্যা উদ্ভবের পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

বেকারত্ব

বেকারত্বের প্রভাব

বেকারত্ব সমাজের সক্ষম, সক্রিয় এবং কর্মে আগ্রহী জনশক্তিকে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে। এতে উৎপাদন ব্যাহত হয়ে মাথাপিছু আয় হ্রাস পায়।

দারিদ্র্যের প্রধান কারণ বেকারত্ব। বেকারত্বের প্রভাবে উৎপাদন ক্ষমতা ও জাতীয় আয় হ্রাস পায়। কারণ উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানগুলোকে সুষ্ঠুভাবে কাজে লাগানোর মাধ্যমে দেশের মোট উৎপাদন ও জাতীয় আয় বৃদ্ধি করা যায়। বেকারত্ব একদিকে শ্রমের অপচয় করছে, তেমনি উৎপাদনের অন্যান্য উপকরণেরও অপচয় করে। দারিদ্র্য বৃদ্ধিতে বেকারত্বের প্রত্যক্ষ প্রভাব রয়েছে।

বেকারত্ব সামাজিক সংঘাতের সহায়ক। বেকারত্ব কর্মক্ষম মানুষের মধ্যে হতাশা ও ব্যর্থতার জন্ম দেয়। হতাশাগ্রস্ত মানুষ সমাজের প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হয়ে উঠে, যা সামাজিক সংঘাত ও কলহ সৃষ্টি করে। বেকারত্বের অসহনীয় যন্ত্রণা মানুষকে অপরাধপ্রবণ করে তুলে। ফলে আইন ও শৃঙ্খলার প্রতি তারা বীতঃশ্রদ্ধ হয়ে উঠে। এতে সামাজিক বিশৃঙ্খলা এবং সমাজ বিপ্লবের পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

বেকারত্বের প্রভাবে শিক্ষিত যুবশক্তির মধ্যে হতাশা ও ব্যর্থতা বৃদ্ধি পায়। বেকারত্বের শিকার শিক্ষিত যুব সমাজের মধ্যে চরম হতাশা বিরাজ করে। ফলে তারা নিজেদের গঠনমূলক ও সৃজনশীল কাজে নিয়োজিত করতে পারে না। বেকার যুবশ্রেণী নেশাগ্রস্ততার মতো ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপে নিজেদের ব্যস্ত রাখছে।

বেকারত্ব

বেকারত্বের প্রভাব

বেকারত্বের প্রভাবে কর্মক্ষম ব্যক্তি বৈধ উপায়ে মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হয়ে অবৈধ উপায় অবলম্বন করতে বাধ্য হয়। বাংলাদেশের ভিক্ষাবৃত্তি, যৌতুক প্রথা, চোরাকারবার, ভদ্রবেশী অপরাধ, দুর্নীতি প্রভৃতি সমস্যা উদ্ভবের পেছনে বেকারত্বের প্রত্যক্ষ প্রভাব রয়েছে।

বেকারত্বের প্রভাবে মানব সম্পদের অপচয় হয়। দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের প্রাথমিক এবং মৌলিক উপাদান হলো মানবসম্পদ। দক্ষ ও যোগ্যতাসম্পন্ন মানবসম্পদ উন্নয়নের অপরিহার্য পূর্বশর্ত। বেকারত্ব এমন একটি সমস্যা, যাতে দেশের দক্ষ-অদক্ষ জনশক্তি উন্নয়ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ থেকে বঞ্চিত হয়। এতে একদিকে যেমন উন্নয়ন ব্যাহত হয়, তেমনি মানব সম্পদের অপচয় হয়।

বেকারত্ব শুধু অন্যতম সমস্যাই নয়; অন্যান্য আর্থ-সামাজিক সমস্যার প্রধান কারণও বটে। বেকারত্বের প্রভাবে উৎপাদন হ্রাস পায় এবং এতে জনগণের মাথাপিছু আয় কমে গিয়ে সঞ্চয় হ্রাস পায়। সঞ্চয় হ্রাস পেলে বিনিয়োগ কম হয়। যার প্রভাবে শ্রমের চাহিদা হ্রাস পেয়ে উচ্চ বেকারত্ব দেখা দেয়। এভাবে বেকারত্বের চক্রাকার প্রভাব সমাজে বিভিন্ন সমস্যা উদ্ভবের পরিবেশ তৈরি করে।

বেকারত্ব

বেকারত্ব মোকাবেলায় সমাজকর্মীর ভূমিকা

সমাজকর্ম একটি সাহায্যকারী পেশা। সমাজকর্মের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো মানুষের সমস্যা সমাধান এবং সমস্যা মোকাবেলার সামর্থ্য শক্তিশালীকরণে সাহায্য করা। সমাজকর্মীরা বিস্তৃত পরিবেশে বিচিত্র ধরনের মানবিক সমস্যা ও সমাজসেবা কার্যক্রমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। সামাজিক ভূমিকা পালনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানব জীবনের প্রতিটি উপাদান নিয়ে সমাজকর্মের অনুশীলন ক্ষেত্র ব্যাপৃত। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই বেকারত্বের মতো সামাজিক সমস্যা মোকাবেলায় সমাজকর্মীদের ভূমিকা পালনের সুযোগ রয়েছে।

বেকার সমস্যা মোকাবেলায় পেশাদার সমাজকর্মের বিভিন্ন হস্তক্ষেপ প্রক্রিয়া (Intervention process of social work) অনুশীলন করার সুযোগ রয়েছে। সামাজিক গবেষণা, সামাজিক নীতি ও পরিকল্পনা, সমষ্টি সমাজকর্ম, সামাজিক কার্যক্রম, ক্ষমতায়ন প্রভৃতি হস্তক্ষেপ কৌশল বেকার সমস্যা মোকাবেলায় প্রয়োগ করা যায়। বেকার সমস্যা মোকাবেলায় সমাজকর্মীরা যেসব উপায়ে ভূমিকা পালন করতে পারে, সেগুলো সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো।

বেকারত্ব মোকাবেলায় সমাজকর্মীর ভূমিকা

গবেষক হিসেবে সমাজকর্মীরা ভূমিকা পালন করতে পারেন। সমাজকর্ম হস্তপেক্ষ প্রক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হলো সামাজিক গবেষণা। সমস্যার কারণ, প্রভাব, সমাধানের উপায় ইত্যাদি বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া হলো গবেষণা। বাংলাদেশে বেকার সমস্যা মোকাবেলায় শ্রমশক্তি জরিপ পরিচালনায় সমাজকর্মীরা ভূমিকা পালন করতে পারে। কারণ বেকারত্ব নিরসনের জন্য শ্রম ও কর্মসংস্থান নীতি, শ্রমশক্তি পরিকল্পনা প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম ও উপযুক্ত প্রযুক্তি ব্যবহারের দিক নির্দেশনার জন্য বেকারত্বের সার্বিক তথ্য সংগ্রহের গুরুত্ব অপরিসীম।

গবেষণা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনার মাধ্যমে বেকার সমস্যা মোকাবেলায় সমাজকর্মীরা ভূমিকা পালন করতে পারেন। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (BBS) শ্রমশক্তি জরিপের (LFS) বাইরে বিকল্প বেকার ও কর্মসংস্থান সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের নিয়মিত কোন প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা বাংলাদেশে নেই। এমতাবস্থায় বাংলাদেশের বেকার সমস্যা বিশ্লেষণ ও নিরসন কৌশল নির্ধারণের লক্ষ্যে নিয়মিত জরিপ পরিচালনার জন্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান থাকা আবশ্যক। এরূপ গবেষণা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনায় সমাজকর্মীরা সাহায্য করতে পারে।

বেকারত্ব

বেকারত্ব মোকাবেলায় সমাজকর্মীর ভূমিকা

সমাজকর্মীরা জনশক্তি নীতি ও জনশক্তি পরিকল্পনা প্রণয়নে ভূমিকা পালন করতে পারেন। বাংলাদেশে বেকারের সংখ্যা, যোগ্যতা, দক্ষতা, শ্রমশক্তি বৃদ্ধির হার, দেশি বিদেশি কর্মসংস্থান খাত, আন্তর্জাতিক বাজারে শ্রমের চাহিদা ও দক্ষতা প্রভৃতি তথ্য সংগ্রহের পর তথ্যভিত্তিক জনশক্তি নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন করা প্রয়োজন। বেকার শ্রমশক্তির শ্রেণীভিত্তিক তালিকা প্রণয়ন এবং সে অনুযায়ী মানব সম্পদ উন্নয়ন ও শ্রমের যোগান দেয়ার দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা নেয়া প্রয়োজন। বাংলাদেশের বিরাজমান বেকার সমস্যার সামগ্রিক দিক বিশ্লেষণ করে একটি জাতীয় কর্মসংস্থান নীতি প্রণয়ন করার গুরুত্ব অপরিসীম। সুনির্দিষ্ট কর্মসংস্থান নীতি প্রণয়ন ছাড়া বিচ্ছিন্ন এবং অসংগঠিত কর্মসূচির মাধ্যমে বেকারত্বের মতো ব্যাপক সমস্যার মোকাবেলা আশা করা যায় না। সমাজকর্মীগণ জনশক্তি নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন কর্তৃপক্ষের সদস্য হিসেবে ভূমিকা পালন করতে পারেন। আবার সামাজিক গবেষণা ও জরিপের মাধ্যমে জনশক্তি নীতি ও জনশক্তি পরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণের মাধ্যমে সমাজকর্মীরা জনশক্তি নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারেন।

বেকারত্ব মোকাবেলায় সমাজকর্মীর ভূমিকা

বাংলাদেশ সরকার অদক্ষ জনগোষ্ঠীকে দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করার জন্য কারিগরি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। বেকার জনগোষ্ঠীর দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে শ্রমশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো দেশের ২৬টি জেলায় ২৬টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করেছে। নারীদের উৎপাদনমুখী কর্মে দক্ষ করে তোলার জন্য ৬টি বিভাগীয় সদরে ৬টি মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। সমাজকর্মীরা এসব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সঙ্গে লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর যোগাযোগ স্থাপনে সহায়তা করতে পারে। অদক্ষ জনগোষ্ঠী, যারা প্রশিক্ষণ পাবার উপযোগী অথচ সচেতনতার অভাবে প্রশিক্ষণ থেকে বঞ্চিত, তাদের চিহ্নিত করে প্রশিক্ষণ লাভে সমাজকর্মীরা সহায়তা করতে পারে। প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর সঙ্গে শিল্প কারখানার সংযোগ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করণে সমাজকর্মীরা সাহায্য করতে পারেন।

আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে বেকার সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মীরা ভূমিকা রাখতে পারেন। কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ জনপদে সমাজকর্ম হস্তক্ষেপ প্রক্রিয়া হলো সমষ্টি উন্নয়ন (Community development)। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কাঠামো কৃষি নির্ভর এবং কৃষি হলো কর্মসংস্থানের প্রধান খাত। কৃষিতে নিয়োগ বৃদ্ধি ছাড়া বিপুল সংখ্যক গ্রামীণ উদ্বৃত্ত শ্রমশক্তির কর্মসংস্থান সম্ভব নয়। সমাজকর্ম হস্তক্ষেপ প্রক্রিয়া সমষ্টি উন্নয়ন প্রয়োগ করে বাণিজ্যিকভাবে কৃষিতে পশু খামার, হাঁস-মুরগি, মৎস্য খামার প্রভৃতি স্থাপন করে বেকার সমস্যা বহুলাংশে হ্রাস সম্ভব। কৃষি নির্ভর আত্ম-কর্মসংস্থান প্রকল্প গ্রহণ বেকার সমস্যা সমাধানের সময়োপযোগী কার্যক্রম হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে।

বেকারত্ব মোকাবেলায় সমাজকর্মীর ভূমিকা

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরিষদের সদস্য হিসেবে সমাজকর্মীদের ভূমিকা পালনের সুযোগ রয়েছে। বাংলাদেশে কর্মসংস্থানের সম্ভাবনাময় খাত হলো বিদেশে শ্রমশক্তি নিয়োগ। সুষ্ঠু পরিকল্পনা এবং কার্যকর নীতিমালার অধীনে বিদেশে জনশক্তি রপ্তানির মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করা সম্ভব। আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ দক্ষ শ্রমশক্তি গড়ে তোলার জন্য জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরিষদ (National Skill Development Council) গঠন করা হয়েছে।

বাংলাদেশে দেশি বিদেশি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা (এনজিও) বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ এবং ঋণ সরবরাহের মাধ্যমে গ্রামীণ পর্যায়ে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। গ্রামীণ ব্যাংক, আশা, প্রশিকা এবং ব্র্যাক আত্ম-কর্মসংস্থানে বিশেষ সাফল্য অর্জন করেছে। এনজিওগুলোর লক্ষ্যভুক্ত দলীয় (Target group) কার্যক্রমে সমাজকর্মীরা দল সমাজকর্মের (Social group work) জ্ঞান, দক্ষতা ও কৌশল প্রয়োগ করে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধিতে সাহায্য করতে পারেন।

বেকারত্ব

বেকারত্ব মোকাবেলায় সমাজকর্মীর ভূমিকা

বাংলাদেশে বেকারত্বের সহায়ক কারণগুলোর মধ্যে শ্রমের মর্যাদার অভাব উল্লেখযোগ্য। "কোন কাজই অমর্যাদাকর নয়" -সমাজে এরূপ শ্রমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা বেকার সমস্যার সমাধানের সহায়ক। শ্রমের যথাযথ মর্যাদা দেয়ার মানসিকতা আত্ম-কর্মসংস্থানের পরিবেশ সৃষ্টি করে। পেশাদার সমাজকর্মের মূল্যবোধ ও নৈতিক মানদণ্ডের আলোকে সমাজকর্মীরা সমাজে শ্রমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করতে পারেন। কারণ সমাজকর্মের দার্শনিক মূল্যবোধ এবং সাধারণ নীতিমালা শ্রমের মর্যাদার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

বাংলাদেশে শ্রমশক্তি ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্ধিত শ্রমশক্তির কর্মসংস্থানের জন্য বেসরকারি পর্যায়ে নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি প্রয়োজন। "চাকরী খুঁজব না, চাকরি দেব"- এরূপ শ্লোগান নিয়ে শিক্ষিত কর্ম প্রত্যাশীদের যদি উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলা যায়, তাহলে বাংলাদেশে কর্মসংস্থানের নতুন ক্ষেত্র সৃষ্টি হবে। ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোক্তা তৈরিতে সমাজকর্মীরা উদ্বুদ্ধকরণ কৌশল প্রয়োগ করতে পারে। এক্ষেত্রে সমাজকর্মীরা উদ্যোক্তা সৃষ্টির পক্ষে যুক্তি উপস্থাপনকারী এবং পরামর্শক হিসেবে ভূমিকা পালন করতে পারেন।

বেকারত্ব

বেকারত্ব মোকাবেলায় সমাজকর্মীর ভূমিকা

বাংলাদেশে বিরাজমান বেকার সমস্যার সমাধান সময় সাপেক্ষ বিষয়। দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা ও সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে এ সমস্যার টেকসই মোকাবেলা করা সম্ভব। বর্তমান বেকারদের কর্মসংস্থান এবং ভবিষ্যৎ বেকারত্ব প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজন জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, দারিদ্র্য নিরসন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি। এসব খাতে বিভিন্ন সামাজিক এজেন্সীর প্রতিনিধি হিসেবে সমাজকর্মীরা ভূমিকা পালন করতে পারেন।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজকর্ম ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৩ – সামাজিক সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মের অনুশীলন

টপিক – ০৫ অপুষ্টি

টপিক ০৫: অপুষ্টি

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

অপুষ্টি

অপুষ্টিজনিত সমস্যা বিশ্বের অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের অন্যতম মানবিক সমস্যা। মানব বিকাশ, মানব সম্পদ উন্নয়ন ও মানব বৃদ্ধির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে সংশ্লিষ্ট বিষয় হলো পুষ্টি। খাদ্যের পুষ্টি উপাদানের (Nutrients) উপর নির্ভর করে মানব বৃদ্ধি ও বিকাশ। বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য মৌলিক মানবিক চাহিদার অন্যতম। মানুষ যেসব খাদ্য গ্রহণ করে সেসব খাদ্যের কাজ হলো দেহের বৃদ্ধিসাধন, তাপ ও শক্তি উৎপন্ন এবং রোগ প্রতিরোধক শক্তি বৃদ্ধি করে দেহ সুস্থ সবল রাখা। খাদ্যের মধ্যে অবস্থিত বিভিন্ন পুষ্টি উপাদান (Nutrients) এসব কাজগুলো সম্পাদন করে। যদি চাহিদা অনুযায়ী সুষম পুষ্টি উপাদান সমৃদ্ধ খাদ্য ধারাবাহিকভাবে কম গ্রহণ করা হয়, তাহলে সে খাদ্য শরীরের চাহিদা মেটাতে পারে না। যার প্রভাবে খাদ্যে পুষ্টি উপাদানগুলোর অভাবজনিত বিভিন্ন লক্ষণ দেখা দেয়।

অপুষ্টি

অপুষ্টি ধারণা ব্যাখ্যার পূর্বে পুষ্টি ধারণাটি (The Concept of Nutrition) ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। পুষ্টি ধারণাটি খাদ্যের বিকল্প কোন ধারণা নয়। পুষ্টি একটি জৈবিক প্রক্রিয়া, যা মানব দেহের সার্বিক সুস্থতা এবং দেহের সকল অংশের স্বাভাবিক ভূমিকার নির্দেশক। যে জৈবিক প্রক্রিয়ায় দেহের খাদ্য পরিপাক ও পরিশোধিত হয়ে সমগ্র দেহের কোষে কোষে ছড়িয়ে পড়ে এবং দেহের ক্ষয়পূরণ, বৃদ্ধি সাধন, রক্ষণাবেক্ষণ ও শক্তি উৎপাদনে সাহায্য করে সে জৈবিক প্রক্রিয়াকে পুষ্টি বলা হয়।

অপুষ্টি

সমাজকর্ম অভিধানের (১৯৯৫) ব্যাখ্যানুযায়ী, পুষ্টি হলো এমন একটি জৈবিক প্রক্রিয়া, যা দ্বারা জীবিত প্রাণী খাদ্যদ্রব্য পরিপাকের পর দেহের মধ্যে শোষণ করে নেয়; যা দেহের বিকাশ, শক্তি এবং বৃদ্ধির জন্য অপরিহার্য। (Nutrition is the process by which living organisms assimilate materials that are necessary for sustenance, energy and growth.)'

সহজভাবে বলা যায়, যে জৈবিক প্রক্রিয়ায় খাদ্যগ্রহণ, পরিপাক, পাচিত খাদ্যবস্তু শোষণ এবং অপাচ্য বস্তু দেহ থেকে নির্গত হয়, সে জৈবিক প্রক্রিয়াকে পুষ্টি বলা হয়। পুষ্টি প্রক্রিয়া সক্রিয় রাখার জন্য খাদ্যের মধ্যে প্রোটিন, শর্করা, ভিটামিন, স্নেহ পদার্থ, খনিজ লবণ, পানি প্রভৃতি পুষ্টি উপাদান সুষম পরিমাণে থাকা আবশ্যক। না থাকলে পুষ্টি প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়। খাদ্যের পুষ্টি উপাদানগুলোকে দেহের নির্দিষ্ট কাজে লাগানোই পুষ্টি প্রক্রিয়ার লক্ষ্য।

অপুষ্টি

অপুষ্টির ধারণা

যে কোন দেশ ও জাতির উন্নয়নের প্রধান উপাদান হলো মানব সম্পদ। আর মানব সম্পদ বিকাশের অন্যতম প্রতিবন্ধক হলো অপুষ্টি। খাদ্যে এক বা একাধিক পুষ্টি উপাদান (যেমন- ভিটামিন, প্রোটিন, শ্বেতসার ও শর্করা, ফ্যাট, খনিজ লবণ) দীর্ঘদিন ধরে অনুপস্থিত থাকার প্রভাবে দেহের বৃদ্ধি, ক্ষয়পূরণ এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ব্যাহত হয়ে সুনির্দিষ্ট কিছু লক্ষণ প্রকাশ পেলে তাকে অপুষ্টি বলা হয়। দেহের প্রয়োজন অনুযায়ী অপরিমিত পুষ্টি উপাদান সমৃদ্ধ খাদ্য ক্রমাগত গ্রহণ করার প্রভাবে দেহের ক্ষয়পূরণ, বৃদ্ধিসাধন, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ইত্যাদির অভাবে কিছু রোগের লক্ষণাদি দেখা দিলে তাকে অপুষ্টি বা পুষ্টিহীনতা বলা হয়। বয়স ও দৈহিক চাহিদা অনুযায়ী খাদ্যে যে পরিমাণ পুষ্টি উপাদান থাকা প্রয়োজন, তার অভাব ঘটলে অথবা অধিক পুষ্টি উপাদান গ্রহণের কারণে পুষ্টি সমস্যা দেখা দিতে পারে। মাসী আমুয়াম

অপুষ্টি

অপুষ্টির ধারণা

সমাজকর্ম অভিধানের ব্যাখ্যানুযায়ী, "অপুষ্টি হলো এমন একটি শারীরিক অবস্থা, যা সাধারণ ভাবে তবে আবশ্যকীয় ভাবে নয়, শারীরিক দুর্বলতার মাধ্যমে প্রকাশ পায়। প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান সমৃদ্ধ খাবার প্রয়োজনের তুলনায় কম পরিমাণে গ্রহণের প্রভাবে পুষ্টিহীনতা দেখা দেয়।" (Malnutrition is a physical condition, usually but not necessarily evidenced by emaciation, due to an insufficiency of needed food elements.) সহজকথায়, দেহের প্রয়োজন অনুযায়ী খাদ্যে পুষ্টি উপাদানের অভাব হলে বা খাদ্যে পুষ্টি উপাদানের আধিক্য ঘটলে শরীরের যে অস্বাভাবিক লক্ষণাদি প্রকাশ পায়, তাকে অপুষ্টি বলা হয়। খাদ্যের গুণগত ও পরিমাণগত ভারসাম্যহীনতার কারণে পুষ্টিহীনতা দেখা দেয়।

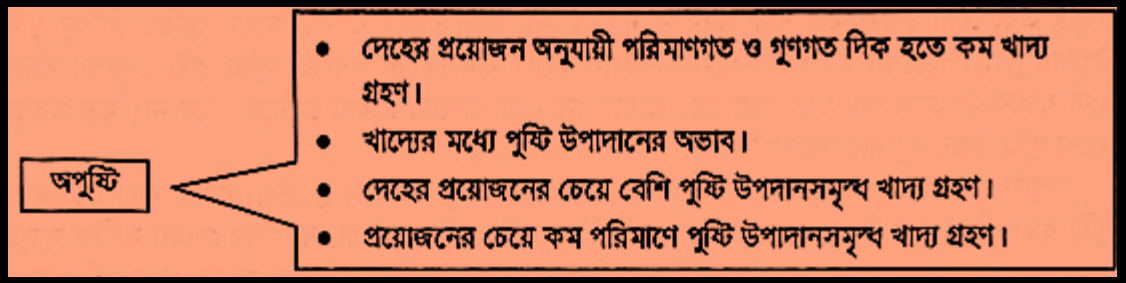

অপুষ্টি

অপুষ্টির ধারণা

প্রকৃতিগতভাবে অপুষ্টি প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ এ দু'ধরনের হয়।

প্রত্যক্ষ অপুষ্টি (Primary malnutrition): সাধারণত অপর্যাপ্ত পরিমাণগত এবং গুণগত খাদ্য গ্রহণের প্রভাবে সৃষ্ট অপুষ্টিকে প্রত্যক্ষ অপুষ্টি বলা হয়। খাদ্যের মধ্যে অত্যাবশ্যক পুষ্টি উপাদান প্রোটিন, ভিটামিন, খনিজ পদার্থ, শর্করা ও শ্বেতসার ইত্যাদির অভাবে প্রত্যক্ষ অপুষ্টি দেখা দেয়। সার্বিকভাবে খাদ্যের অভাব, খাদ্য ক্রয় করার আর্থিক অক্ষমতা অথবা ত্রুটিপূর্ণ খাদ্যাভাসের প্রভাবে প্রত্যক্ষ অপুষ্টি দেখা দেয়।

পরোক্ষ অপুষ্টি (Secondary malnutrition) : নির্দিষ্ট ধরনের পুষ্টিকর খাদ্য উপাদান (nutrients) যখন রোগজনিত কারণে দেহ শোষণ বা ব্যবহার করতে অক্ষম হয়, তখন পরোক্ষ অপুষ্টি দেখা দেয়। অনেক সময় পাকস্থলীর প্রদাহ, লিভার, থাইরয়েডগ্রন্থি, কিডনী, অগ্ন্যাশয় ইত্যাদির রোগজনিত কারণে নির্দিষ্ট খাদ্য উপাদান শরীর শোষণ বা ব্যবহার করতে অক্ষম হয়; যার প্রভাবে পরোক্ষ অপুষ্টি দেখা দেয়।

অপুষ্টি

অপুষ্টির ধারণা

অপুষ্টির প্রভাবে-

১. দেহের শক্তি ও কর্মক্ষমতা হ্রাস পায়;

২. শারীরিক গঠন ও বিকাশ ব্যাহত হয়;

৩. শরীরের ক্ষয় পূরণ ব্যাহত হয় এবং

৪. রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস পায়।

৫. অপুষ্টির প্রভাবে রিকেট, স্কার্ভি, বেরিবেরি, প্ল্যাগরা, কোয়শিওয়কর ইত্যাদি রোগ দেখা দেয়।

অপুষ্টি

অপুষ্টির ধারণা

অপুষ্টি বাংলাদেশের প্রধান বহুমাত্রিক স্বাস্থ্য সমস্যা। ধারাবাহিক শক্তিদায়ক খাদ্যের অভাব, প্রোটিনের অভাব, মায়েদের অপুষ্টি, শিশুদের জন্মকালীন কম ওজন প্রভৃতি বাংলাদেশের মারাত্মক স্বাস্থ্য সমস্যা। নিরক্ষরতা, অজ্ঞতা, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, দারিদ্র্য, লিঙ্গ বৈষম্য, খাদ্য ঘাটতি এবং খাদ্যদ্রব্যের অসম বণ্টন, শিশুদের মাতৃদুধের বিকল্প খাদ্যের অভ্যাস ইত্যাদি অপুষ্টি সমস্যার জন্য দায়ী। বিভিন্ন গবেষণা রিপোর্টের পরিসংখ্যান অনুযায়ী মহিলা বিশেষ করে গর্ভবতী ও প্রসূতি মা এবং শিশুরা সবচেয়ে বেশি পুষ্টিহীনতার শিকার। বাংলাদেশে প্রণীত দ্বিতীয় খাদ্য ও পুষ্টিনীতিতে অপুষ্টির জন্য প্রধানত পাঁচটি কারণকে দায়ী করা হয়েছে। এগুলো হলো-

১. খাদ্য উৎপাদনের ঘাটতি, খাদ্য বিনষ্ট, সংরক্ষণ ও অসম বন্টন।

২. অধিক জনসংখ্যা, অপর্যাপ্ত জনস্বাস্থ্য পরিচর্যা, বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাব এবং নিম্ন মানের জীবন পরিবেশ।

৩. খাদ্যের পুষ্টিমান সম্পর্কে জনগণের অজ্ঞতা।

৪.সংস্কারবশত পরিবারের মধ্যে শিশু ও নারীদের কম খাদ্য গ্রহণ।

৫. দারিদ্র্য, নিম্ন ক্রয়ক্ষমতা এবং পর্যাপ্ত উপার্জনের অভাব।

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অপুষ্টির উল্লেখযোগ্য কারণগুলো এখানে আলোচনা করা হলো।

অপুষ্টি

বাংলাদেশে অপুষ্টির কারণ

বাংলাদেশে পারিবারিক পর্যায়ে খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার প্রভাবে অপুষ্টি বৃদ্ধি পাচ্ছে। পারিবারিক খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থায় প্রতিটি পরিবার পর্যাপ্ত খাদ্যসংগ্রহের সক্ষমতার ও সুস্থ থাকার জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য পাওয়ার নিশ্চয়তা থাকে। পারিবারিক আয়, আবাদযোগ্য ভূমির পরিমাণ, পারিবারিক শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ধারা, পরিবারের আকার, খাদ্য ও পুষ্টি জ্ঞান, জনস্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা এবং মৌসুম দ্বারা পারিবারিক পর্যায়ে খাদ্য নিরাপত্তা প্রভাবিত হয়।

খাদ্য ঘাটটি বাংলাদেশে অপুষ্টির অন্যতম কারণ। বাংলাদেশ সরকারের খাদ্য ও দুর্যোগ মন্ত্রণালয়, জাতিসংঘের খাদ্য কর্মসূচি (WFP), কৃষি ও খাদ্য সংস্থা (FAO) এর সহযোগিতায় বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (Bangladesh Institute of Development Studies-BIDS) খাদ্য প্রাপ্যতা নির্ধারণ, ভোগ প্রবণতা ও বাংলাদেশ পুষ্টিমান নির্ধারণ শিরোনামে সমীক্ষা পরিচালনা করে। সমীক্ষার প্রতিবেদন অনুযায়ী সব মিলিয়ে দেশের ২৬ শতাংশ পরিবারের খাদ্য ঘাটতি সারা বছরই থাকে, ২২ শতাংশ পরিবার মাঝেমধ্যে খাদ্য ঘাটতিতে থাকে এবং উদ্বৃত্ত খাদ্য থাকে ২৩ দশমিক ৯ শতাংশ পরিবারের। দেশের ৬৫.৭শতাংশ পরিবারই খাদ্যের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে বাজারের উপর নির্ভরশীল, এবং ২৩.৭ শতাংশ পরিবারকে উৎপাদনের পাশাপাশি বাজার থেকেও কিনতে হয়।

অপুষ্টি

বাংলাদেশে অপুষ্টির কারণ

কম খাদ্যশক্তি গ্রহণ বাংলাদেশে অপুষ্টির অন্যতম কারণ। উচ্চতা ও ওজন অনুযায়ী দেশের নারী-পুরুষ মিলিয়ে দৈনিক গড় প্রয়োজন ২১৮৭ কিলোক্যালরী। পুরুষের প্রয়োজন ২৫২৬ কিলোক্যালরী এবং নারীদের ১৯০৮ কিলোক্যালরী। তবে গড়ে মানুষ পায় ৬৮১ গ্রাম খাদ্য, যেখান থেকে পাওয়া যায় ১৮৯৪ কিলোক্যালরী খাদ্যশক্তি। অর্থাৎ দেশের মানুষ প্রয়োজনের তুলনায় ২৯৩ কিলোক্যালরী কম পাচ্ছে।' খাদ্য নিরাপত্তার পরিস্থিতি প্রসঙ্গে গবেষণায় বলা হয়েছে, খাদ্য নিরাপত্তার দিক থেকে বেশির ভাগ পরিবারই সারা বছর খাদ্য সংকটে থাকে। খানা আয় ব্যয় জরিপ ২০১৬ অনুযায়ী দৈনিক মথাপিছু প্রোটিন গ্রহণের পরিমাণ ৬৩.৮ গ্রাম এবং ক্যালরীর গ্রহণের গড় পরিমাণ ২২১০.৪ কিঃ ক্যালরি।

বাংলাদেশে অন্যান্য সমস্যার মতো অতিরিক্ত জনসংখ্যা অপুষ্টির প্রধান কারণ। বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তার হুমকি হলো অতিরিক্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধি। এর প্রভাবে দেশে খাদ্য উৎপাদন অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি পাওয়া সত্বেও খাদ্য ঘাটতি লেগেই আছে। চাহিদা এবং উৎপাদনের মধ্যে ব্যবধান থাকায় মাথা পিছু খাদ্য গ্রহণের মাত্রা কমে যায়। বর্ধিত জনসংখ্যার জন্য প্রতিবছর বিপুল পরিমাণ খাদ্যশস্য আমদানী ও সাহায্য হিসেবে গ্রহণ করে জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা জোরদারের চেষ্টা করা হলেও খাদ্য ঘাটতি অব্যাহত রয়েছে।

অপুষ্টি

বাংলাদেশে অপুষ্টির কারণ

বাংলাদেশে দারিদ্র্য হলো অপুষ্টির অন্যতম প্রধান কারণ। বাংলাদেশে পারিবারিক পর্যায়ে খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার ঝুকির মধ্যে রয়েছে ভূমিহীন কৃষক, দিনমজুর, গৃহহীন পরিবার, উদ্বাস্তু এবং চরাঞ্চল ও দ্বীপের মতো ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠী। বাংলাদেশে পরিচালিত সবগুলো পুষ্টি জরিপের ফলাফল পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, দেশের সিংহভাগ লোক খাদ্যাভাবে কোন না কোন ভাবে পুষ্টিহীনতায় ভোগে। সমাজবিজ্ঞানীরা এ ধরনের অপুষ্টি পরিস্থিতিকে 'প্রচ্ছন্ন দুর্ভিক্ষ' হিসেবে আখ্যায়িত করে থাকেন। দারিদ্র্যের প্রভাবে সৃষ্ট খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার ঝুঁকি পুষ্টিহীনতার মৌলিক কারণ।

পুষ্টি উপাদান সমৃদ্ধ খাদ্যের অভাব বাংলাদেশে অপুষ্টির অন্যতম প্রধান কারণ। গুণগত ও পরিমাণগত পুষ্টি উপাদান সমৃদ্ধ খাদ্য কম গ্রহণের প্রভাবে দেহের পুষ্টি প্রক্রিয়ার মধ্যে অন্তরায় সৃষ্টি হলে পুষ্টিহীনতা দেখা দেয়। পুষ্টিহীনতার প্রত্যক্ষ কারণ হলো খাদ্যে পুষ্টি উপাদানের ঘাটতি। খাদ্যে ক্রমাগত আমিষ, ক্যালরী, ভিটামিন, আয়োডিন, ক্যালসিয়ামের অভাব পুষ্টিহীনতার অন্যতম প্রধান কারণ।

অপুষ্টি

বাংলাদেশে অপুষ্টির কারণ

মানবদেহের অভ্যন্তরীণ রোগব্যাধির প্রভাব অপুষ্টির জন্য বিশেষভাবে দায়ি। মানবদেহের অভ্যন্তরীণ রোগজনিত কারণে পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্য গ্রহণ ও শোষণের অভাবে পুষ্টিহীনতা দেখা দেয়। হাম, নিউমনিয়া, যক্ষ্মা, ডায়রিয়া প্রভৃতি রোগের কারণে শিশুর দৈহিক ক্ষয়বৃদ্ধি পায় এবং ক্ষুধা মন্দা দেখা দেয়। এরূপ অসুস্থতার সময়ে এবং পরে বিভিন্ন পুষ্টিকর খাবার পর্যাপ্ত পরিমাণে না দিলে শিশুর অপুষ্টি দেখা দিতে পারে।

বাংলাদেশে অব্যাহত অপুষ্টির প্রধান কারণ অপুষ্টির দুষ্ট চক্রের প্রভাব। অপুষ্টির দুষ্ট চক্রের মূল কথা হলো, অপুষ্ট কিশোরী হয়ে উঠে একজন অপুষ্ট মা এবং জন্ম দেয় কম ওজনের অপুষ্ট শিশু। মায়ের অপুষ্টির প্রভাবে স্বাভাবিক ওজনের চেয়ে কম ওজন নিয়ে শিশু জন্ম গ্রহণ করায় কম মেধা নিয়ে সে বেড়ে উঠে। পরিণত বয়সে এরূপ অপুষ্ট ও কম মেধাসম্পন্ন কিশোর অদক্ষ এবং কম উৎপাদন ক্ষমতাশীল দরিদ্র জনগোষ্ঠীতে যুক্ত হয়। দরিদ্রদের উৎপাদন ক্ষমতা কম বলে আয় কম। যার প্রভাবে কম সেবা, কম পরিচর্যা এবং কম স্বাস্থ্য লাভ করে। পরিণতিতে আবার অপুষ্টি। এভাবে চক্রাকারে ক্রিয়াশীল অপুষ্টির দুষ্ট চক্র অপুষ্টির প্রসার ঘটায়। বাংলাদেশে অপুষ্টির দুষ্ট চক্র, পুষ্টিহীনতার প্রধান কারণ।

অপুষ্টি

বাংলাদেশে অপুষ্টির কারণ

খাদ্যাভাস অপুষ্টির কারণ হিসেবে প্রভাব বিস্তার করে। বাংলাদেশে শিশুদের খাদ্যাভাস সংশ্লিষ্ট অপুষ্টির কারণের মধ্যে রয়েছে—

- শিশুকে বুকের দুধ পান না করানো;
- জন্মের পর শিশুকে মায়ের বুকের শাল দুধ না দিয়ে অন্যকিছু দেয়া;
- মায়ের দুধের বিকল্প শিশুদের বোতলে দুধ পান করানোর প্রবণতা বৃদ্ধি;
- পাঁচ মাস বয়সের পূর্বে শিশুকে পরিপূরক খাবার প্রদান এবং দুধ কমিয়ে দেয়া,
- প্রসূতি মাকে কুসংস্কার বশত পুষ্টিকর খাদ্য থেকে বঞ্চিত করা;

দারিদ্র্য এবং আর্থিক অস্বচ্ছলতার জন্য শিশু এবং গর্ভাবস্থায় মাকে পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাবার না দেওয়া । যার প্রভাবে মা ও শিশু উভয়ে অপুষ্টির শিকার হয় । খাদ্য ও পুষ্টিমান সম্পর্কে জনগণের বিশেষ করে মহিলাদের অশিক্ষা ও অজ্ঞতা বাংলাদেশে পুষ্টিহীনতার অন্যতম প্রধান কারণ।

অপুষ্টি

বাংলাদেশে অপুষ্টির কারণ

দারিদ্র্য এবং আর্থিক অস্বচ্ছলতার জন্য শিশু এবং গর্ভাবস্থায় মাকে পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাবার না দেওয়া । যার প্রভাবে মা ও শিশু উভয়ে অপুষ্টির শিকার হয় । খাদ্য ও পুষ্টিমান সম্পর্কে জনগণের বিশেষ করে মহিলাদের অশিক্ষা ও অজ্ঞতা বাংলাদেশে পুষ্টিহীনতার অন্যতম প্রধান কারণ। খাদ্য তৈরির সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত মহিলাদের অশিক্ষা ও অজ্ঞতা বাংলাদেশে পুষ্টি সমস্যা বৃদ্ধির সহায়ক। পুষ্টি জ্ঞানের অভাবে প্রাপ্ত খাদ্যের পুষ্টিমান বজায় রাখা, নারী ও মেয়েদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। অজ্ঞতা এবং কৃসংস্কারের প্রভাবে প্রসূতি মা ও সদ্যজাত শিশুকে পুষ্টিকর খাদ্য থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। অনেক সময় ঐতিহ্যগত খাদ্যাভাস খাদ্যের পুষ্টিমান বজায় রাখার ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। অধিক রান্না করে খাদ্যের সাদ বৃদ্ধি এবং ভাতের উপর অধিক নির্ভরশীলতা অপুষ্টির জন্য অনেকাংশে দায়ী।

অপুষ্টি

বাংলাদেশে অপুষ্টির কারণ

বাংলাদেশে পুষ্টিহীনতার কারণগুলোর মধ্যে জাতীয় ও পারিবারিক পর্যায়ে খাদ্যসামগ্রী কটনের অসমতা অন্যতম। যৌথ পরিবার ব্যবস্থা, সামাজিক কুসংস্কার ও পারিবারিক রীতিনীতির প্রভাবে বাড়ন্ত শিশু, গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়েদের অধিক পুষ্টির প্রয়োজন হওয়া সত্ত্বেও তাদের উপেক্ষা করা হয়। জাতীয় পর্যায়ে দেশের বৃহত্তর দরিদ্র জনগোষ্ঠী অসম কটনের শিকার।

পুষ্টিহীনতা বংশানুক্রমে বিস্তারের ক্ষেত্রে বাল্যবিবাহ এবং কিশোরী মায়েদের ঘন ঘন সন্তান প্রসব প্রত্যক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করে। বাল্যবিবাহের প্রভাবে কম বয়সে ঘন ঘন সন্তান প্রসবের ফলে কিশোরী মা নিজে পুষ্টিহীনতায় ভোগে এবং পুষ্টিহীন মায়ের সন্তানের জন্মকালীন ওজনও কম হয়। এদের অপুষ্টিতে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা বেশি থাকে। ভেজাল মিশ্রিত খাদ্যদ্রব্যের প্রভাব পুষ্টিহীনতার অন্যতম কারণ। অসাধু ব্যবসায়ীদের মধ্যে অধিক মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে খাদ্যে ভেজাল মিশ্রণের প্রবণতা পুষ্টিহীনতা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। সমাজদেহে পুষ্টিহীনতা বিস্তারে ভেজাল খাদ্যের প্রভাব বাংলাদেশে অব্যাহত রয়েছে।

অপুষ্টি

বাংলাদেশে অপুষ্টির কারণ

সামাজিক কুসংস্কার ও দৃষ্টিভঙ্গির নেতিবাচক প্রভাব অপুষ্টির কারণ রূপে চিহ্নিত। সমাজে খাদ্য সম্পর্কে এমন কিছু যুক্তিহীন কুসংস্কার প্রচলিত রয়েছে, যা পুষ্টিহীনতার জন্য দায়ী। গর্ভবতী মায়ের সন্তান ও খাদ্য খাওয়া সম্পর্কে আঞ্চলিক পর্যায়ে প্রচলিত কুসংস্কার গর্ভবতী মা ও শিশুর পুষ্টির ক্ষেত্রে অন্তরায় সৃষ্টি করে। গর্ভবতী মাকে বোয়াল মাছ, বাইন মাছ, ক্ষীর, নারকেল, কচু তরকারী প্রভৃতি দেয়া নিয়ে বিভিন্ন কুসংস্কার রয়েছে। কৃমির ভয়ে শিশুকে চিনি, কলা ইত্যাদি না দেওয়া এবং ভূত-প্রেতের নজরের ভয়ে শিশুকে শাল দুধ না দেয়া প্রভৃতি কুসংস্কার পুষ্টিহীনতার সহায়ক। বাংলাদেশে অপুষ্টির কারণগুলোর মধ্যে পুষ্টিকর খাদ্য উৎপাদনের ঘাটতি অন্যতম। বাংলাদেশে বেশির ভাগ জমিতে শুধু খাদ্যশস্য উৎপাদিত হয়। পুষ্টিকর শাকসব্জি, ফলমূল উৎপাদনের প্রতি জনগণ তেমন গুরুত্ব দেয়া না। জাতিসংঘের জাতিসংঘ শিশু তহবিল (UNICEF) রেখাচিত্রের মাধ্যমে শিশু অপুষ্টির বহুমাত্রিক কারণসমূহ তুলে ধরেছে। এখানে রেখাচিত্রটি দেয়া হলো।

অপুষ্টি

বাংলাদেশে অপুষ্টির কারণ

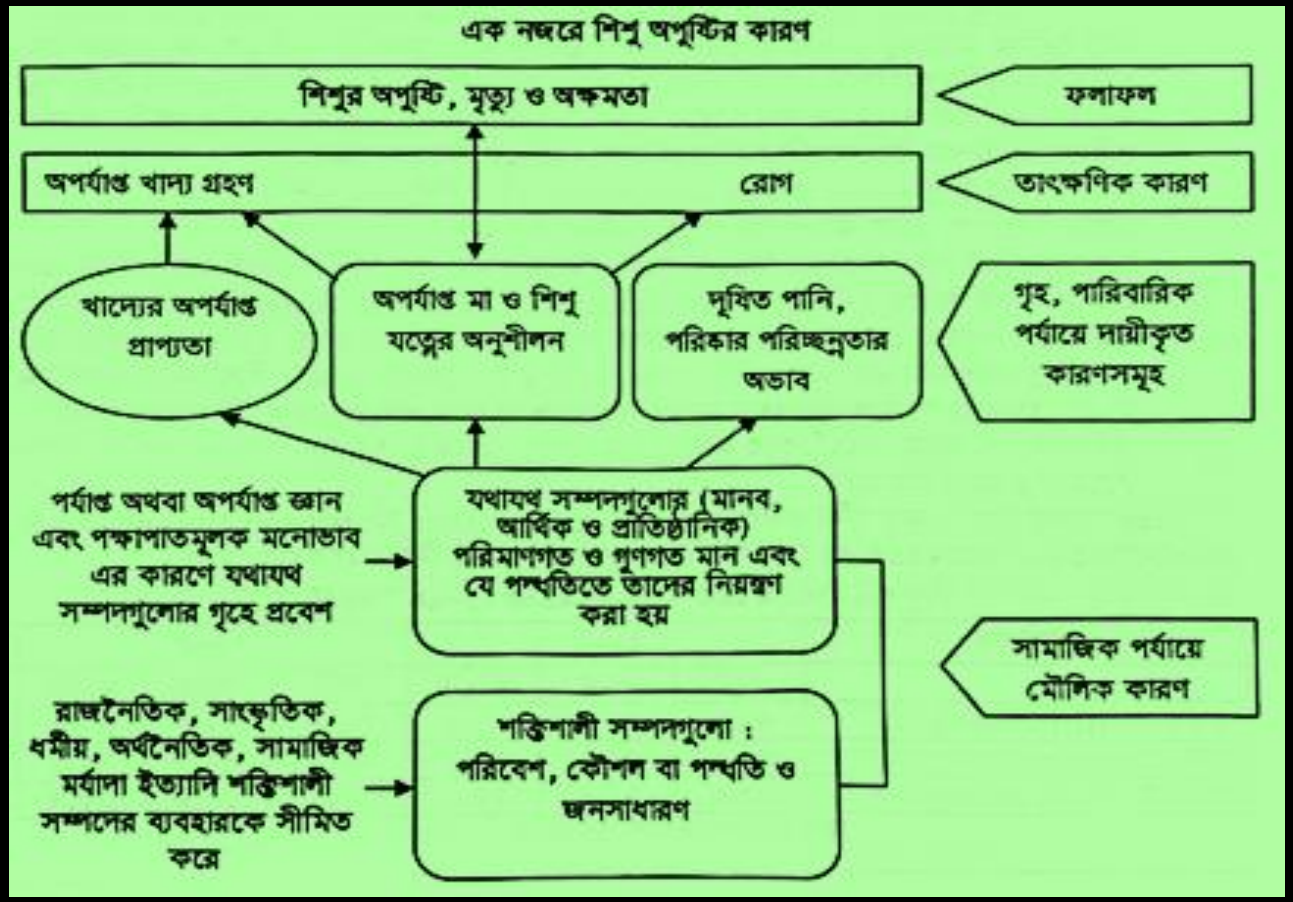

অপুষ্টি

বাংলাদেশে অপুষ্টির পরিস্থিতি

বিশ্ব ব্যাংকের তথ্যানুযায়ী "Malnutrition is only one symptoms of poverty." অর্থাৎ অপুষ্টি দারিদ্র্যের একমাত্র উপসর্গ বা কারণ। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এ উক্তিটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য। অপুষ্টির দুষ্টচক্র বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নকে ব্যাহত করছে। চক্রাকারে ক্রিয়াশীল অপুষ্টির প্রভাব দেশের সার্বিক মাতৃ ও শিশুস্বাস্থ্য ব্যবস্থার প্রতি হুমকি সৃষ্টি করছে।

প্রকৃতপক্ষে একটা দেশের পুষ্টি সমস্যা শিশুর জন্মের আগেই শুরু হয়, যার প্রধান কারণ গর্ভবতী মায়ের অপুষ্টি। শিশু জন্মের পরবর্তী পর্যায়ে অপুষ্টির বিস্তার ঘটে। বাংলাদেশে শিশুদের মধ্যে প্রধানত নিচের অপুষ্টিজনিত সমস্যাগুলো দেখা যায়-

- প্রোটিন ক্যালরীয় অপুষ্টি (Protiein Energy Malnutrition - PEM);
- কম ওজনের শিশু
- ভিটামিন ‘এ’র অভাবজনিত অপুষ্টি ;
- অপুষ্টিজনিত এ্যানিমিয়া বা রক্তশূন্যতা,

অপুষ্টি

বাংলাদেশে অপুষ্টির পরিস্থিতি

বাংলাদেশে এসব অপুষ্টিজনিত পরিস্থিতি সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

•প্রোটিন ক্যালরীয় অপুষ্টি (Protiein Energy Malnutrition-PEM) : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্যানুযায়ী জনগোষ্ঠীর বিরাট সংখ্যক বিশেষ করে মা ও শিশু প্রোটিন ও শক্তির,অভাবজনিত অপুষ্টিতে (PEM) ভোগছে। পরিসংখ্যান ব্যুরোর ২০১০ সালের তথ্যানুযায়ী বাংলাদেশে গড়ে দৈনিক মাথাপিছু ক্যালরি গ্রহণের পরিমাণ ২৩১৬ কিলোক্যালরী। পল্লী এলাকায় ২৩৪৫ এবং শহরে ২২৪৪ কিলোক্যালরী। আর দৈনিক মাথাপিছু প্রোটিন গ্রহণের গড় পরিমাণ ৬৬ গ্রাম মাত্র। পল্লী এলাকায় ৬৫ এবং শহরে ৬৯ গ্রাম।[৩] খানা আয় ব্যয় জরিপ ২০১৬ অনুযায়ী মাথাপিছু প্রোটিন গ্রহণের পরিমাণ ৬৩.৮ গম এবং ক্যালরী গ্রহণের পরিমাণ ২২১০.৪ কিলোক্যালরী।

অপুষ্টি

বাংলাদেশে অপুষ্টির পরিস্থিতি

কম ওজনের শিশু (Low Birth Weight - LBW) : শিশু জন্ম যদি ২.৫ কেজি বা ২৫০০ গ্রামের নিচে হয়, তাকে কম ওজনের শিশু (LBW) ধরা হয়।

• যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ক সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল ফুড পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট এবং সমন্বিত খানা জরিপ ২০১০-১১ (Intregrated Household Survey) এর তথ্যানুযায়ী বাংলাদেশে শতকরা ৩৬ ভাগ শিশু স্বাভাবিকের চেয়ে কম ওজন নিয়ে জন্মে, ৪১ ভাগ খর্বাকৃতি, ৯০ ভাগ শিশু রক্তশূন্যতা এবং এক তৃতীয়াংশ মা অপুষ্টি ও রক্তশূন্যতায় ভুগছে। শিশুর জন্ম ওজন কম হওয়ার প্রধান কারণ হলো গর্ভাবস্থায় মায়ের অপর্যাপ্ত খাদ্য গ্রহণ এবং মায়ের অপুষ্টি। খাদ্য সম্পর্কিত কুসংস্কার, গর্ভাবস্থায় আয়োডিনের অভাব, অল্প বয়সে গর্ভধারণ, ঘন ঘন গর্ভধারণ প্রভৃতি কারণে শিশুর জন্ম ওজন কম হয় ।

অপুষ্টি

বাংলাদেশে অপুষ্টির পরিস্থিতি

২০০৫ সালের শিশু ও মাতৃ পুষ্টি জরিপের (Child and Mother Nutrituon Survey 2005) এর আলোকে ১৯৮৫ এবং ২০০৫ এর পুষ্টি পরিস্থিতির তুলনামূলক চিত্র নিচের ছকে দেয়া হলো।

শিশু পুষ্টিহীনতায় প্রকোপ ১৯৮৫-২০০৫ (৫-৬১ মাস) %

নির্দেশক	১৯৮৫			২০০৫		
	পল্লী	শহর	জাতীয়	পল্লী	শহর	জাতীয়
কম ওজন (Underweight)	৭২.০	৬২.৩	৭০.১	৫০.০	৩৮.৫	৪৭.৮
চরম (Stunting)	৬৮.৯	৫৭.১	৬৭.৫	৪৪.৯	৩২.৫	৪২.৪
অত্যন্ত নাজুক (Wasting)	১৫.৪	১৪.০	১৫.৩	১৩.১	১০.৮	১২.৭

উৎস : পরিসংখ্যান পকেট বুক ২০১১। পৃ-৪২৭।

অপুষ্টি

বাংলাদেশে অপুষ্টির পরিস্থিতি

বাংলাদেশে পুষ্টি পরিস্থিতির তুলনামূলক চিত্র

সূচক	২০০৭	২০১১	২০১৭
কম ওজনের শিশু (%) (০-৫৯ মাস)	৪১	৩৬	৩২.৬
খর্বাকৃতির (stunting) শিশু (%) (০-৫৯ মাস)	৪৩	৪১	৩৬.১
শিশুর মাতৃদুগ্ধ পানের হার (৫)	৪৩	৬৪	৫৫.৩
কৃষ্ণকায় (wasting) শিশু	১৭.৪		১৪.৩

উৎস : অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৯

অপুষ্টি

বাংলাদেশে অপুষ্টির পরিস্থিতি

কোন সমাজই সামগ্রিকভাবে পরিপূর্ণ নয়। সমাজ বিকাশের কোন পর্যায়েই সমাজ সমস্যামুক্ত ছিল না।

পাঁচ বছরের নিচের শিশুদের পুষ্টি পরিস্থিতি (২০০৭–২০১৭) (%)

বৈশিষ্ট্য	২০০৭	২০১১ (%)	২০১৪ (%)	২০১৭ (%)
খর্বকায় শিশু (stunting)	৪৩.০০%	৪১.০০	৩৬.০	৩১.০০
কর্ম ওজন (underweight)	৪১.০০	৩৬.০০	৩৩.০০	২২.০০
অত্যন্ত নাজুক (wasting)	১৭.০০	১৬.০০	১৪.০০	৮.০০

উৎস : বাংলাদেশ জনমিতি ও স্বাস্থ্য জরিপ–২০১৭–১৮

অপুষ্টি

বাংলাদেশে অপুষ্টির পরিস্থিতি

বাংলাদেশ সরকার গৃহীত বিভিন্ন পুষ্টি কার্যক্রমের প্রভাবে পুষ্টি পরিস্থিতি উল্লেখযোগ্য হারে উন্নতি হচ্ছে। শহরের তুলনায় গ্রামে অপুষ্টির হার বেশি। খর্বাকার শিশু (stunting) গ্রামে ৩৩ শতাংশ আর শহরে ২৫ শতাংশ। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা শিশু বৃদ্ধি ও বিকাশের আদর্শিক মডেল হিসেবে মায়ের দুধ পান করানোকে নির্ধারণ করেছে।

বাংলাদেশে ০-৫ মাস বয়সের শিশুদের মাতৃদুগ্ধ পানের হার ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। জনমিতি ও স্বাস্থ্য জরিপ ২০০৭ এর তথ্যানুযায়ী ছিল ৪৩ শতাংশ। ২০১৭-১৮ সালে তার বৃদ্ধি পেয়ে ৬৫ শতাংশ শিশুতে উন্নীত হয়েছে। ৭৯ শতাংশ শিশু (৬-৫৯ মাস) সম্পূরক ভিটামিন এ গ্রহণ করেছে।

অপুষ্টি

বাংলাদেশে অপুষ্টির পরিস্থিতি

• ভিটামিন 'এ'র অভাবজনিত অপুষ্টি : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্যানুযায়ী বাংলাদেশে ৬–১৭ সতর মাসের শিশুদের শতকরা ১.৭৮ ভাগ রাতকানায় আক্রান্ত। সব বয়সের শতকরা ১.৯৭ ভাগ মেয়ে এবং ১.৫৯ ভাগ ছেলে শিশু রাতকানায় আক্রান্ত। বাংলাদেশে প্রতিরোধযোগ্য অপুষ্টিজনিত অন্ধত্ব অন্যতম স্বাস্থ্য সমস্যা। প্রতিবছর ভিটামিন 'এ'র অভাবে ৩০ হাজার শিশুর অন্ধত্বের পাশাপাশি ছয় বছরের কম বয়সী শিশুর মধ্যে অপুষ্টিজনিত অন্ধত্ব দেখা দিয়েছে। প্রতিবছর এক লাখ আশি হাজার হতে সোয়া তিন লাখ গর্ভবতী মহিলা রাতকানা রোগে ভোগে। এসব পরিসংখ্যানগুলো অপুষ্টির ধারাবাহিক চিত্র তুলে ধরছে।

• অপুষ্টিজনিত রক্তশূন্যতা বা অ্যানিমিয়া : বাংলাদেশে অপুষ্টিজনিত রক্তশূন্যতার সমস্যা অত্যন্ত ব্যাপক। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর পকেট বুক ২০১১-এর তথ্যানুযায়ী জাতীয় পর্যায়ে শতকরা ৩৩.৩ ভাগ প্রাপ্ত বয়স্ক মহিলা, শতকরা ৪৫.৫ ভাগ গর্ভবতী ও ৩৫.৩ ভাগ প্রসুতি মা এবং পাঁচ বছরের নিচের বয়সের শতকরা ৪৯.২ ভাগ শিশু লৌহের অভাবজনিত অ্যানিমিয়ায় বা রক্তশূন্যতায় আক্রান্ত। '

অপুষ্টি

বাংলাদেশে অপুষ্টির পরিস্থিতি

• আয়োডিনের অভাবজনিত অপুষ্টি : বাংলাদেশে আয়োডিনের অভাবজনিত সমস্যার প্রভাবেগলগন্ড রোগ ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। আয়োডিন স্বল্পতার কারণে প্রথম জীবনেই হাজার হাজার শিশু মানসিক প্রতিবন্ধীর শিকার হচ্ছে। বাংলাদেশের প্রায় সকল শ্রেণীর লোক আয়োডিনের অভাবজনিত সমস্যার ঝুঁকি বহন করছে। প্রতিবছর আয়োডিনের অভাবে বিপুল সংখ্যক শিশু মৃত জন্ম নিচ্ছে এবং অসংখ্য শিশু আয়োডিনের অভাবজনিত বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে জন্ম নিচ্ছে। দেশের উত্তরাঞ্চলের মাটি ও পানিতে আয়োডিনের অভাব থাকায় চাহিদার তুলনায় আয়োডিনের সরবরাহ কম। বর্তমানে আয়োডিনযুক্ত লবণ উৎপাদন ও সরবরাহের মাধ্যমে এ সমস্যার মোকাবেলা করার প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে।

বাংলাদেশে বিরাজমান অপুষ্টি পরিস্থিতিকে 'Silent emergency' –র সঙ্গে তুলনা করা যায়। তবে দেশের গুরুতর অপুষ্টি সমস্যা প্রশাসনিক নীতি নির্ধারক ও রাজনীতিবিদদের দৃষ্টি আকর্ষণ করায় অনেকের মতে এটি শুধু 'Silent emergency' নয় এটি একধারে বৃহত্তর অদৃশ্য (Invisible) জরুরী বিষয়ও বটে। কারণ অপুষ্টির প্রভাবে শিশুর মৃত্যুর হার বৃদ্ধি, আয়ুকাল হ্রাস, বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ ব্যাহত, মানব সম্পদ উন্নয়নসহ আর্থিক ও জাতীয় উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয় ।

অপুষ্টি

অপুষ্টির প্রভাব

অপুষ্টি এমন একটি জটিল সমস্যা, যা ব্যক্তিগত পর্যায় থেকে জাতীয় এমনকি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মানব বিকাশে দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব ফেলে। মানব বৃদ্ধি, বিকাশ ও আচরণে অপুষ্টির সুদূরপ্রসারী প্রভাব রয়েছে। খাদ্যে বিভিন্ন পুষ্টি উপাদানের অভাবে সৃষ্ট অপুষ্টির প্রভাব সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

অপুষ্টি

প্রোটিন শক্তি ঘাটতিজনিত অপুষ্টির প্রভাব

স্বাস্থ্য গঠন ও রক্ষার অপরিহার্য পুষ্টিকর উপাদান হলো প্রোটিন বা আমিষ। মানুষের আচার আচরণে অংশগ্রহণকারী উৎসেচক, হরমোন, ভিটামিন, অ্যান্টিবডি সবই আমিষ দিয়ে তৈরি। জীবের একটিই বৈশিষ্ট্য, তারা প্রোটিন দিয়ে তৈরি। জীবকোষের প্রধান উপাদান হলো প্রোটিন। প্রোটিনকে বলা হয় Bricks of body building" দেহের গঠন, বিকাশ স্বাভাবিক এবং সুস্থ ও কর্মক্ষম রাখার জন্য খাদ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণ প্রোটিন ও ক্যালরি থাকতে হয়। খাদ্যে প্রোটিন ও ক্যালরীর অভাবজনিত কারণে সৃষ্ট অপুষ্টিকে, প্রোটিন শক্তি ঘাটতিজনিত অপুষ্টি (Protein Energy Malnutrition-PEM) বলা হয়।

বাংলাদেশ এবং বিশ্বের অনুন্নত দেশগুলোতে শিশু পুষ্টির ক্ষেত্রে প্রধান সমস্যা হলো প্রোটিন শক্তি ঘাটতিজনিত অপুষ্টি (PEM)। বাংলাদেশের অনুর্ধ পাঁচ বছরের শিশুদের অধিকাংশ কোন না কোন মাত্রায় অপুষ্টিতে ভোগছে। মারাত্মক প্রোটিন শক্তি ঘাটতিজনিত (PEM) অপুষ্টির প্রভাবে সৃষ্ট রোগকে ম্যারাসমাস বা হাড্ডিসার এবং কোয়ারশিয়রকর অর্থাৎ গা-ফোলা এ দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

অপুষ্টি

প্রোটিন শক্তি ঘাটতিজনিত অপুষ্টির প্রভাব

ম্যারাসমাস বা হাড্ডিসার: খাদ্যে প্রোটিনের সঙ্গে মোট ক্যালরীর (খাদ্য শক্তি) চাহিদা পূরণ না হলে পুষ্টির অভাবে যে উপসর্গ দেখা দেয়, তাকে ম্যারাসমাস বা হাড্ডিসার বলা হয়। এটি যেকোন বয়সে হবার সম্ভাবনা থাকলেও প্রধানত দু'বছর বয়সের শিশুদের বেশি দেখা যায়। দুর্ভিক্ষ ও খাদ্যাভাবের সময় প্রোটিনের অভাবজনিত ম্যারাসমাস রোগ বেশি দেখা দেয়।

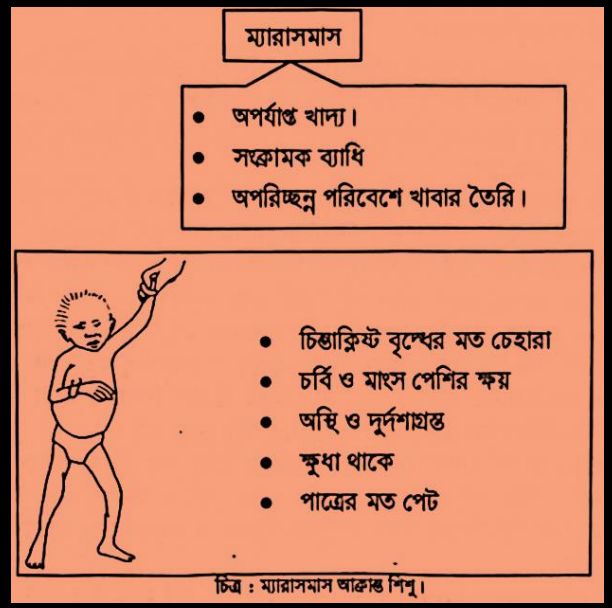

চিত্র : ম্যারাসমাস আক্রান্ত শিশু।

অপুষ্টি

প্রোটিন শক্তি ঘাটতিজনিত অপুষ্টির প্রভাব

কোয়ারশিয়রকর বা গা ফোলা (Kwashiorkor): প্রোটিনের অভাবজনিত অপুষ্টির প্রভাবে সৃষ্ট অন্যতম রোগ হলো কোয়ারশিয়রকর বা গা-ফোলা। প্রধানত এক থেকে চার বছর বয়সের শিশুরা এ রোগে বেশি আক্রান্ত হয়। ঘানার রাজধানী আক্রার এবং তার আশেপাশের অঞ্চলের উপজাতীয় অধিবাসীরা এ রোগের নামকরণ করেন কোয়ারশিয়রকর; যার দেশজ অর্থ হলো "নতুন শিশুর জন্মের পর তার পূর্বে শিশুটির মধ্যে যে রোগ দেখা যায়।" ১৯৩৩ সালে সিসলি উইলিয়ামস নামক মনীষী প্রথম প্রোটিনের অভাবকে গা-ফোলা রোগের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেন। বিশ্বের অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে, যেখানকার শিশুরা স্বল্প পরিমাণ দুধ ও প্রোটিন জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করে, সেখানে এ রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি।

অপুষ্টি

প্রোটিন শক্তি ঘাটতিজনিত অপুষ্টির প্রভাব

প্রোটিনের অভাবে কোয়ারশিয়রকর রোগ হলেও এর পেছনে নিচের প্রধান দু'টি কারণ বিদ্যমান। যেমন-

১. ঘনঘন সন্তান প্রসব মা ঘন ঘন গর্ভবতী হলে কোলের শিশুকে বুকের দুধ বন্ধ করে দেয়া হয়। এর ফলে শিশুকে শ্বেতসার বহুল খাদ্য (যেমন- ভাত, আলু, আটা) অভ্যস্থ করলে শিশুর খাদ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রোটিনের অভাব হয়। এতে প্রোটিনের অভাবে কোয়াশিয়রকর দেখা দেয়।

২. শিশু বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হওয়া শিশুর হাম, অন্ত্রের প্রদাহ প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত এবং পুষ্টিকর খাদ্য থেকে বঞ্চিত হলে প্রোটিনের ঘাটতির প্রভাবে কোয়ারশিয়রকর দেখা দেয়।

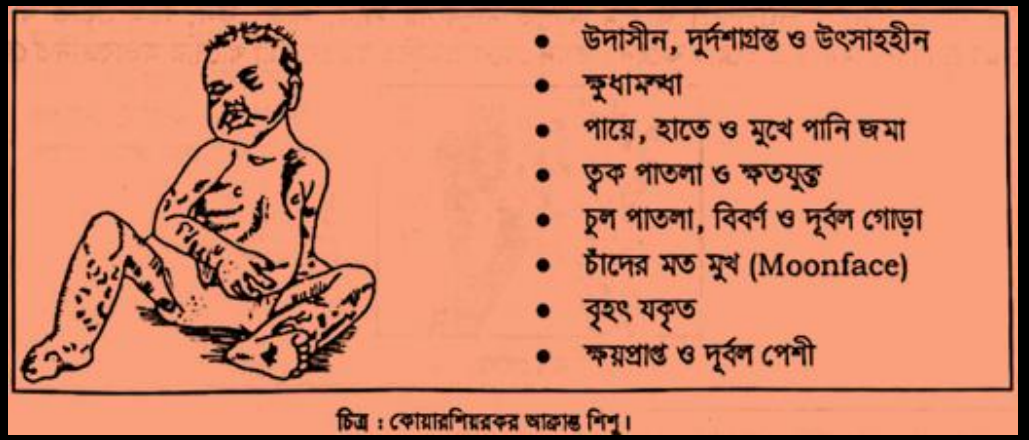

চিত্র : কোয়ারশিয়রকর আক্রান্ত শিশু।

অপুষ্টি

প্রোটিন শক্তি ঘাটতিজনিত অপুষ্টির প্রভাব

ভিটামিন এর অভাবজনিত অপুষ্টির প্রভাব

খাদ্যের অপরিহার্য পুষ্টি উপাদান হলো ভিটামিন (Vitamins)। প্রাণীদেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধি এবং শরীর সুস্থ রাখার জন্য ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ অপরিহার্য। ভিটামিনের প্রকৃতি ও মানের পরিপ্রেক্ষিতে ইংরেজি বর্ণমালা অনুযায়ী বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন প্রকার ভিটামিন চিহ্নিত করেছেন। বিভিন্ন প্রকার ভিটামিনের মধ্যে রয়েছে ভিটামিন ‘এ', 'বি', ‘সি', ‘ডি’, ‘ই’ এবং ‘কে’। গর্ভবতী মা ও গর্ভের শিশুর স্বাস্থ্য রক্ষা, সুস্থ সন্তান জন্মদানে ভিটামিন সাহায্য করে। স্নায়ু, পেশী, জিহ্বা, চোখ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গের সুস্থতার জন্য ভিটামিন অত্যাবশ্যক পুষ্টি উপাদান।

• ‘এ’ ভিটামিনের অভাবজনিত রোগ : দীর্ঘদিন ‘এ’ ভিটামিনের অভাব এবং ধারাবাহিক ঘাটতিতে চোখের রোগ দেখা দেয়। রাতকানা রোগের প্রধান কারণ 'এ' ভিটামিনের অভাব। বাংলাদেশে ভিটামিন 'এ'র অভাবে প্রতিবছর প্রায় এক লাখ ৮০ হাজার হতে তিন লাখ ২৫ হাজার গর্ভবতী মহিলা রাতকানা রোগে ভোগে। ভিটামিন ‘এ' খাওয়ানোর মাধ্যমে প্রতিদিন পাঁচ বছরের কমবয়সী চার থেকে পাঁচশত শিশু মৃত্যু রোধ করা সম্ভব। '

অপুষ্টি

প্রোটিন শক্তি ঘাটতিজনিত অপুষ্টির প্রভাব

• 'ডি' ভিটামিনের অভাবজনিত রোগ: ভিটামিন ডি-এর অভাবে শিশুদের মধ্যে রিকেট (Rickets) এবং বড়দের মধ্যে অস্টিও-ম্যালেশিয়া (Osteo-malacia) রোগ দেখা দেয়।

রিকেট (Rickets): রিকেট সাধারণত বর্ধনরত শিশুদের মধ্যে এবং বয়ঃসন্ধিক্ষণে কিশোরীদের মধ্যে দেখা যায়। দ্রুত দেহবর্ধনের সময় শিশুর হাড়গুলো বাড়তে থাকে। সুস্থ ও মজবুত হাড় গঠনের জন্য ভিটামিন ডি-এর গুরুত্ব অপরিসীম। 'ডি' ভিটামিনের অভাব হলে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের স্বাভাবিক কার্যাবলি ব্যাহত হয়ে রিকেট রোগ দেখা দেয়।

অস্টিও-ম্যালেশিয়া (Osteomalacia): অস্টিও-ম্যালেশিয়ার অর্থ হচ্ছে হাড় নরম হয়ে যাওয়া। বয়স্ক মহিলাদের ভিটামিন ডি-এর অভাবে এ রোগ হয়ে থাকে। পুরুষের অপেক্ষা মহিলাদের এই রোগ বেশি হয়।

অপুষ্টি

প্রোটিন শক্তি ঘাটতিজনিত অপুষ্টির প্রভাব

• 'সি' ভিটামিনের অভাবজনিত রোগ: ভিটামিনের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হলো ভিটামিন সি। টাটকা ফল ও সবজি বিশেষ করে লেবু, আমলকি, পেয়ারা, জাম্বুরা, ইত্যাদি টক জাতীয় ফলে ভিটামিন সি পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকে। 'সি' ভিটামিনের অভাবে স্কার্ভি এবং পেলেগ্রা রোগ দেখা দেয়।

স্কার্ভি (Scurvey): ভিটামিন সি স্কার্ভি রোগ প্রতিরোধ করে। দীর্ঘদিন ধরে ভিটামিন সি-এর অভাবে স্কার্ভি (Scurvey) রোগ দেখা যায়। যে কোন বয়সেই ভিটামিন সি-এর অভাবে স্কার্ভি রোগ দেখা দিতে পারে। তবে কিশোর বয়সে, গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়েদের মধ্যে স্কার্ভি রোগ বেশি দেখা যায়। স্কার্ভি রোগের বর্ণনা অতি প্রাচীনকাল থেকে পাওয়া যায়। খ্রিস্টপূর্ব ৪৫০ অব্দে হিপোক্রাটস স্কার্ভি রোগের বর্ণনা দেন। তাঁর বর্ণনায় স্কার্ভি রোগে দাঁতের মাড়ি ফুলে নরম, দাঁত নড়বড়ে, দাঁতের মাড়ি থেকে রক্ত পড়া, হাত ও পা ব্যথা, পা ফুলে যায়।

পেলেগ্রা : পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে পেলেগ্রা রোগ দেখা দেয়। ইটালিয়ান ভাষায় পেলেগ্রা (Pellegra) শব্দের অর্থ খসখসে ত্বক। পেলেগ্রার বৈশিষ্ট্য হলো ত্বক লাল হয়ে ফুলে যায়, চুলকায় এবং ক্রমান্বয়ে কাল ও খসখসে হয়। এরূপ বৈশিষ্ট্যের জন্য ১৭৭১ খ্রিস্টাব্দে এ রোগের নাম পেলেগ্রা দেয়া হয়। যুক্তরাষ্ট্রের মনীষী গোল্ড বার্গার (Gold Burger) আশ্রমে আশ্রিত মানুষদের মাংস, সব্জি, ফল, ডিম প্রভৃতি খাবার দিয়ে পেলেগ্রা রোগ নিরাময় ও প্রতিরোধ করেন। তখন থেকে প্রমাণিত হয় পেলেগ্রা খাদ্যের অভাবজনিত রোগ।

অপুষ্টি

প্রোটিন শক্তি ঘাটতিজনিত অপুষ্টির প্রভাব

খনিজ পদার্থের অভাবজণিত অপুষ্টির প্রভাব

খাদ্যের পুষ্টি উপাদানের (Nutrient) মধ্যে খনিজ পদার্থ অন্যতম। দেহে খনিজ পদার্থের পরিমাণ সামান্য হলেও এগুলোর অভাব হলে মারাত্মক সমস্যা দেখা দিতে পারে। দেহকোষের গঠন, রক্ষণাবেক্ষণ, জীবনীশক্তি প্রদান প্রভৃতি কাজে খনিজ পদার্থ অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করে। দেহে খনিজ পদার্থগুলোর উপাদান হলো- ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, পটাশিয়াম, লোহা, আয়োডিন, দস্তা, তামা ইত্যাদি। প্রধান কয়েকটি খনিজ পদার্থের অভাবজনিত অপুষ্টির প্রভাব সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

১. ক্যালসিয়াম (Calcium): বহুদিন ধারাবাহিকভাবে ক্যালসিয়ামের ঘাটতি থাকলে হাড়ের ক্যালসিয়াম অপসৃত হয়ে ক্যালসিয়ামের অভাবজনিত বিভিন্ন লক্ষণ দেখা দেয়।

ক্যালসিয়ামের অভাবজনিত রোগের লক্ষণগুলো হলো-

• শিশুর হাড় দুর্বল ও সরু হয়ে যাওয়া; শিশুর চেহারায় বিকৃতি ভাব দেখা দেয়;

• দাঁতের গঠন মজবুত না হওয়া; রক্তরসে ক্যালসিয়ামের মাত্রা কমে গেলে স্নায়ুর উত্তেজনা বৃদ্ধি ও টিটানী রোগ দেখা দেয়।

শিশুদের রিকেট রোগ, সন্তান সম্ভবা মায়ের অস্টিও-ম্যালেশিয়া (Asteomalacia) রোগ ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ও ভিটামিন ডি'র মিলিত অভাবে দেখা দেয়।

অপুষ্টি

প্রোটিন শক্তি ঘাটতিজনিত অপুষ্টির প্রভাব

২. লৌহ (Iron) : খাদ্য উপাদানের মধ্যে মানব দেহে লোহার পরিমাণ অতি অল্প হলেও দেহের জন্য এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খনিজ পদার্থ। একজন সুস্থ ব্যক্তির দেহে ৪-৫ গ্রাম লৌহ থাকে। এ লৌহের অর্ধেক রক্তে থাকে ও বাকি অর্ধেক শরীরে জমা থাকে। সব মিলিয়ে মানবদেহের সমস্ত হিমোগ্লোবিনে অবস্থিত লোহার পরিমাণ প্রায় ২.৫ গ্রাম। এই হিমোগ্লোবিনের মাধ্যমে দেহের ৯৮ শতাংশ অক্সিজেন পরিবাহিত হয় (উইকপিডিয়)। খাদ্যে লৌহের অভাব হলে অ্যানিমিয়া বা রক্তশূন্যতা রোগ হয়। এরূপ অবস্থায় রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ হ্রাস পায়। এতে দেহে অক্সিজেন পরিবহনে বিঘ্ন ঘটে। প্রধানত মহিলাদের মধ্যে অ্যানিমিয়া বা রক্ত শূন্যতা দেখা দেয়।

অপুষ্টি

প্রোটিন শক্তি ঘাটতিজনিত অপুষ্টির প্রভাব

৩. আয়োডিন (Iodin): খনিজ পদার্থের মধ্যে মানবদেহের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হলো আয়োডিন। বাংলাদেশে আয়োডিনের অভাবজনিত সমস্যা অত্যন্ত ব্যাপক। আয়োডিনের অভাবে সৃষ্ট দৈহিক সমস্যাগুলো নিচে আলোচনা করা হলো-

• গলগন্ড (Goiter): আয়োডিনের অভাবে সৃষ্ট রোগের মধ্যে মারাত্মক রোগ হলো গলগন্ড। বাংলাদেশে উত্তরাঞ্চলে রংপুর বিভাগের কয়েকটি জেলায় এ রোগ মহামারী আকারে বিরাজ করছে। খাদ্যে আয়োডিন কম থাকলে থাইরয়েড হরমোনের সংশ্লেষণ কমে যায়। এতে থাইরয়েড হরমোনের ক্ষরণ কমে এবং রক্তে আয়োডিনের পরিমাণ হ্রাস পায়। দেহে আয়োডিনের অভাবে থাইরয়েড গ্রন্থি আয়তনে বৃদ্ধি পায়। থাইরয়েড গ্রন্থির আকার স্বাভাবিক আকারের চেয়ে বড় হয়ে গেলে তাকে গলগণ্ড বলা (Goiter) হয়। আয়োডিনের অভাবে এই লক্ষণটি সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। গলগণ্ড রোগের প্রভাবে দৈহিক ও সামাজিক সমস্যা দেখা দেয়। গলগণ্ড আক্রান্ত ব্যক্তি সমাজে স্বাভাবিক সম্পর্ক বজায় রেখে আচার আচরণ করতে পারে না।

অপুষ্টি

প্রোটিন শক্তি ঘাটতিজনিত অপুষ্টির প্রভাব

• হাবাগোবা ও বামনত্ব (ফ্রেটিনিজম) : যখন গর্ভবতী মা আয়োডিনের অভাবে ভোগেন, তখন তিনি হাবাগোবা সন্তানের জন্ম দেন। ভ্রূণের বৃদ্ধির বিশেষ পর্যায়ে গর্ভস্থ ভ্রূণ প্রয়োজনীয় পরিমাণে আয়োডিন না পেলে, শিশুর মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্রের মারাত্মক ক্ষতি হয়। আয়োডিনের অভাবে শিশু বামন হয় এবং এর সাথে বোবা, কালা হতে পারে ।

• বিকলাঙ্গ সন্তান প্রসব ও প্রজনন সমস্যা : আয়োডিনের ঘাটতির শিকার গর্ভবতী মহিলাদের অন্যান্য গর্ভবতীদের তুলনায় গর্ভপাত ও মৃত শিশুর জন্ম বেশি হয়। মায়ের আয়োডিনের অভাব হলে সন্তান বিকলাঙ্গ হয়ে জন্ম নিতে পারে। হাত অস্বাভাবিক ছোট হওয়া, অঙ্গবিকৃত হওয়া, অম্পূর্ণ থাকা প্রভৃতি আয়োডিনের অভাবে হয়।

• শিশু মৃত্যু : আয়োডিনের অভাবে শিশুরা পুষ্টি সমস্যায় ভোগে। শিশুদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস পায়। এসব কারণে শিশুদের মৃত্যুর হার বেশি হয় ।

অপুষ্টি

অপুষ্টি মোকাবেলায় সমাজকর্মীর ভূমিকা

বাংলাদেশে অপুষ্টি একটি জটিল এবং বহুমাত্রিক সমস্যা। দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা ও সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ ছাড়া অপুষ্টি সমস্যা মোকাবেলা করা সম্ভব নয়। অপুষ্টি সমস্যা মোকাবেলায় সমাজকর্মের জ্ঞান ও কৌশল প্রয়োগের সুযোগ রয়েছে। সমাজকর্মীরা অপুষ্টি মোকাবেলায় বিভিন্নভাবে ভূমিকা পালন করতে পারে। সমাজকর্মীরা গবেষক হিসেবে পুষ্টি বিষয়ে গবেষণা করতে পারেন। অন্যদিকে পুষ্টি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন গবেষণার ফলাফল পুষ্টি কার্যক্রমে প্রয়োগে সহায়তা করতে পারেন। সমাজকর্মের হস্তক্ষেপ কৌশল সমাজকর্ম গবেষণার জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োগ করে অপুষ্টি বিষয়ে গবেষণা ও জরিপ পরিচালনায় সমাজকর্মীরা গবেষক হিসেবে ভূমিকা পালন করতে পারে। পুষ্টি সমস্যা সমাধানকল্পে যেমন প্রয়োজন এর কারণ, প্রভাব, পরিধি ইত্যাদি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ, তেমনি প্রয়োজন স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত খাদ্যদ্রব্য, গাছ-গাছড়া, ফল-মূল হতে কৃত্রিম পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্য প্রস্তুত প্রণালী উদ্ভাবন। সুতরাং উভয়ক্ষেত্রে পুষ্টি জরিপ ও গবেষণার গুরুত্ব অপরিসীম। ধারাবাহিক পুষ্টি জরিপ পরিচালনা পুষ্টি সমস্যা সমাধানের অপরিহার্য পূর্বশর্ত। অপুষ্টি সংশ্লিষ্ট বাস্তব অবস্থা উপলব্ধির বিজ্ঞানসম্মত কৌশল হলো অব্যাহত পুষ্টি বিষয়ে জরিপ ও গবেষণা।

অপুষ্টি

অপুষ্টি মোকাবেলায় সমাজকর্মীর ভূমিকা

সমাজকর্মীরা বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি হাসপাতাল, শিশু ও মাতৃকল্যাণ এজেন্সীতে কর্মরত। এসব এজেন্সীর প্রতিনিধি হিসেবে অপুষ্টির শিকার শিশু ও মায়েদের পুনর্বাসনে কাজ করতে পারে। সমাজকর্মীরা দরিদ্র ও নিঃস্ব পরিবারের অপুষ্টির শিকার শিশুদের উন্নয়নকল্পে দেশি-বিদেশি সাহায্য সংস্থার সহায়তায় পুষ্টি পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপন এবং অপুষ্টির শিকার শিশুদের জরুরি ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় খাদ্য ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারে।

খাদ্য পুষ্টি বৃদ্ধিকরণ (Food Fortification) কার্যক্রমে সমাজকর্মীরা সহায়তা করতে পারে। বাংলাদেশে অপুষ্টিজনিত সমস্যা মোকাবেলার জন্য খাদ্য পুষ্টি বৃদ্ধিকরণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম। বৃহত্তর পরিবারে অপুষ্টি সমস্যা মোকাবেলা এবং প্রয়োজনীয় পুষ্টির অভাব মেটানোর জন্য খাদ্য পুষ্টি বৃদ্ধিকরণ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। খাদ্যের পুষ্টিগুণ পুনরুদ্ধার, সংযোজন, সমৃদ্ধকরণ, মান নিয়ন্ত্রণ এবং পুষ্টিবৃদ্ধিকরণকে বলা হয় খাদ্য পুষ্টি বৃদ্ধিকরণ (Food fortification)। সংক্ষেপে খাদ্য পুষ্টিকরণ হচ্ছে ভোক্তার প্রয়োজনীয় পুষ্টির অভাব মেটানোর জন্য খাদ্যে পুষ্টি সংযোজন পদ্ধতি।

অপুষ্টি

অপুষ্টি মোকাবেলায় সমাজকর্মীর ভূমিকা

গলগন্ড রোগের চিকিৎসা ও প্রতিরোধের জন্য খাদ্যে আয়োডিনের অভাব মেটাতে সাধারণ লবণের সঙ্গে আয়োডিন মেশানোর পরামর্শ দেয়ার মাধ্যমে খাদ্য পুষ্টি বৃদ্ধিকরণ ধারণা উদ্ভব হয়। পরবর্তীতে বিভিন্ন ধরনের অপুষ্টিজনিত রোগের প্রাদুর্ভাব কমানোর জন্য বিভিন্ন প্রকার খাদ্যে পুষ্টি বর্ধিতকরণ পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। ভিটামিন 'এ' র অভাবজনিত রাতকানা রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য ১৯১৭ সালে ডেনমার্কে এবং ১৯৪০ সালে যুক্তরাজ্যে মার্জারিনের (Margarine) সঙ্গে ভিটামিন 'এ' মিশিয়ে খাদ্য পুষ্টি বৃদ্ধি করার প্রক্রিয়া শুরু হয়। এভাবে মেশিনে গম ভাঙ্গানো বা মিহিকরণের সময় নষ্ট হয়ে যাওয়া পুষ্টিমান পুনরুদ্ধারের জন্য থায়ামিন, নিকোটিনিক এসিড এবং লৌহ সাদা ময়দা এবং সাদা রুটির সঙ্গে যোগ করা শুরু হয়। ক্যালসিয়ামের অভাব পূরণের জন্য রুটিতে ক্যালসিয়াম যোগ করা হয়।

প্রচলিত পুষ্টিসেবা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিতে সমাজকর্মীরা ভূমিকা পালন করতে পারেন। বাংলাদেশে গলগন্ড বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পাওয়া একটি রোগ। বাংলাদেশ সরকার লবণের সঙ্গে আয়োডিন মেশানোর আইন তৈরী ও তা বাস্তবায়নের কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন। জাতিসংঘের শিশু তহবিল (ইউনিসেফ) এবং বাংলাদেশ ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থা (বিসিক) যৌথ উদ্যোগে লবণে আয়োডিন মেশানো কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। বাংলাদেশে ভিটামিন 'এ'-র অভাবে উদ্ভূত জনস্বাস্থ্যগত বিরাট সমস্যা শিশুদের অন্ধত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে।

অপুষ্টি

অপুষ্টি মোকাবেলায় সমাজকর্মীর ভূমিকা

সমাজকর্মীরা জাতীয় পুষ্টিসেবা কার্যক্রমে সমাজকর্মের কৌশল প্রয়োগ করতে পারেন। জাতীয় পুষ্টিসেবা (National Nutrations Services-NNS) সারাদেশে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে পুষ্টিসেবা প্রদান করছে। এর মূল কার্যাবলীর মধ্যে রয়েছে- আচরণ পরিবর্তন যোগাযোগ; প্রশিক্ষণ; জন্ম ওজন গ্রহণ ও নিবন্ধন; দু' বছরের কম বয়সী শিশু ও মহিলাদের সম্পূরক খাবার প্রদান; অনুপুষ্টি (ভিটামিন 'এ' ও আয়রণ ফলেট) সম্পূরণ; কিশোর-কিশোরী ও নবদম্পতি ফোরাম পরিচালনা ইত্যাদি।

জাতীয় পুষ্টিসেবা কর্মসূচির অন্যতম কার্যক্রম হচ্ছে এলাকাভিত্তিক সামাজিক পুষ্টি কার্যক্রম (এবিসিএন) যা সারাদেশে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এতে সামাজিক পুষ্টিকর্মী, সামাজিক পুষ্টি সংগঠক এবং ফিল্ড সুপারভাইজার মাঠ পর্যায়ে কাজ করছে। প্রায় আড়াই লক্ষাধিক মহিলা কর্মী সম্পূরক খাদ্য তৈরী এবং পুষ্টি সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে। এসব কার্যক্রম অপুষ্টি সমস্যা মোকাবেলার সঙ্গে আয় বৃদ্ধি, ক্ষমতায়ন এবং সর্বোপরি দারিদ্র্য বিমোচনে ভূমিকা রাখছে। উপজেলা ম্যানেজার, সংশ্লিষ্ট এনজিও কর্মকর্তা এবং জাতীয় পুষ্টি কর্মসূচির কর্মকর্তাদের তত্ত্বাবধানে এ সকল মাঠকর্মীরা মাঠ পর্যায়ে পুষ্টি কার্যক্রম বায়স্তবায়ন করছে। দল সমাজকর্ম এবং সমষ্টি উন্নয়ন প্রক্রিয়া প্রয়োগের মাধ্যমে সমাজকর্মীরা সামাজিক পুষ্টি কার্যক্রমের লক্ষ্যার্জনে সহায়তা করতে পারেন।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজকর্ম ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৩ – সামাজিক সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মের অনুশীলন

টপিক – ০৬ যৌতুক

টপিক ০৬: যৌতুক

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

যৌতুক

বাংলাদেশের আলোচিত সামাজিক অনাচার হচ্ছে যৌতুক (Dowry)। যৌতুকের দাবিকে কেন্দ্র করে হৃদয়হীন ও অমানবিক চাপ প্রয়োগ এবং নির্মম পন্থা অবলম্বনের ঘটনা প্রতিনিয়ত দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশ হয়। নারী নির্যাতনের অমানবিক প্রথা এবং সামাজিক অনাচার হলো যৌতুক।

যৌতুক প্রথার পটভূমি আলোচনা করলে দেখা যায়, হিন্দু সমাজে অতীতে যাকে পণ প্রথা বলা হতো, বর্তমানে তা পরিবর্তিত রূপে যৌতুক প্রথা হিসেবে পরিচিত। হিন্দু আইনে পৈত্রিক সম্পত্তিতে কন্যার উত্তরাধিকার স্বীকৃত না থাকায় কন্যার বিবাহের সময় নগদ অর্থ ও দ্রব্যসামগ্রী দেয়ার প্রথা হিন্দু সমাজে ঐতিহ্যগতভাবে চলে আসছে। আদিতে বর কনের নতুন সংসার সাজানোর জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বিয়েতে উপহার হিসেবে দেয়া হতো। সময়ের পরিবর্তনে এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের পরিবর্তন হয়ে সর্বনাশা যৌতুক প্রথার রূপ লাভ করে। আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের ফলে ধীরে ধীরে এটি মুসলিম সমাজে প্রবেশ করে। ইসলামে যৌতুক প্রথার প্রচলন নেই এবং মুসলিম সমাজে উপঢৌকন দেয়া নেয়ার রীতি চিরকাল ধরে চলে আসছে। কালক্রমে বিবাহের উপঢৌকন জোর করে ও দর কষাকষির মাধ্যমে নেয়ার প্রবণতা সমাজে ছড়িয়ে পড়ে। এ প্রবণতা যৌতুকরূপে সামাজিক ব্যাধির মতো সমাজ জীবনে বিরাজ করছে।

যৌতুক

যৌতুকের ধারণা

সাধারণভাবে যৌতুক হলো এমন একটি সামাজিক কু-প্রথা, যাতে বিবাহের সময় কনে ও বরপক্ষের মধ্যে দর কষাকষির মাধ্যমে বরপক্ষকে নগদ অর্থ, দ্রব্য-সামগ্রী বা অন্য কোন আর্থিক সুবিধা দানে কন্যাপক্ষকে বাধ্য করা হয়। এতে কনের পিতা-মাতার আর্থিক সঙ্গতি বিবেচনা করা হয় না। এটি একটি নির্যাতনমূলক প্রথা, যা বিবাহ ও পরিবারের প্রতি মারাত্মক হুমকির সৃষ্টি করছে।

ওয়েবস্টারস নিউ ইন্টারন্যাশনাল ডিকসনারীর (Websters New International Dictionary) ব্যাখ্যানুযায়ী, "বিবাহের সময় একজন নারী তার স্বামীকে প্রদত্ত নগদ অর্থ, দ্রব্যসামগ্রী অথবা ভূমি হলো যৌতুক।" (Dowry is the money, goods or estate, which a woman brings to her husband in marriage.)

সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স র‍্যাডিন সাধারণ অর্থে যৌতুক বলতে, সে সব সম্পদকে বুঝায়েছেন যেগুলো ব্যক্তি বিবাহের সময় তার স্ত্রী অথবা স্ত্রীর পরিবার থেকে পেয়ে থাকে। (Ordinarialy dowry is the property which a man receives when he marriage, either from his wife or her family.)

যৌতুক

যৌতুকের ধারণা

বাংলাদেশ যৌতুক নিরোধ আইন ১৯৮০-তে অনেক উপাদানের সমন্বয়ে যৌতুকের (Dowry) পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। উক্ত আইনের সংজ্ঞানুযায়ী, "যৌতুক বলতে বিবাহের এক পক্ষের দ্বারা, অপর পক্ষের প্রতি অথবা বিবাহের সময় বা পূর্বে যে কোন সময় উক্ত পক্ষগণের (বর-কনে) বিবাহের প্রতিদান হিসেবে বিবাহের যে কোন পক্ষের পিতামাতা দ্বারা অপর পক্ষকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দিতে সম্মত হওয়া সম্পত্তি বা মুল্যবান জামানতকে বোঝায়। তবে ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী প্রদেয় দেনমোহর বা মোহরানা এবং বিবাহের কোন পক্ষ (বর-কনে) ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি জিনিসের মাধ্যমে যার মূল্য পাঁচশত টাকার অধিক নয় এরূপ উপহার উক্ত আইনে যৌতুক হিসেবে ধরা হয়নি বা তা যৌতুক হিসেবে গণ্য হবে না।

যৌতুক প্রথার সবচেয়ে অমানবিক দিক হলো, এতে বিবাহের বিনিময়ে কনে পক্ষকে যৌতুক দিতে বাধ্য করা হয়। যৌতুক হলো রুচিহীন, চটকদার, সামাজিক অনাচার (glaring social evils)।

যৌতুক

যৌতুকের প্রথার কারণ

বাংলাদেশে যৌতুক প্রথার কারণ সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে নিহিত। সামাজিক রীতি-নীতি, মূল্যবোধ, সম্পদের অসম কটন ব্যবস্থা ইত্যাদির পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হিসেবে যৌতুক প্রথা সামাজিক সমস্যার রূপ ধারণ করেছে। যৌতুক প্রথার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কতিপয় কারণ আলোচনা করা হলো।

যৌতুকের অন্যতম প্রধান কারণ দারিদ্র্য। সমাজে যদি দারিদ্র্য না থাকতো তবে যৌতুক প্রথা সামাজিক সমস্যারূপে চিহ্নিত হতো না। সমাজে ধনী পরিবারের পিতামাতার নিকট যৌতুক আভিজাত্য, সৌখিনতা, আদর, সোহাগ, গৌরবজনক এবং আনন্দের প্রতীক। আর দরিদ্র পরিবারে যৌতুক অমানবিক সমস্যারূপে চিহ্নিত। অনুকরণপ্রিয়তা মানব চরিত্রের সহজাত প্রবৃত্তি। উচ্চ ও সম্পদশালীদের যৌতুক প্রদানের প্রবণতার অনুকরণে বাংলাদেশে মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত ও দরিদ্র শ্রেণীতে যৌতুকের দাবি প্রসারিত হচ্ছে।

পুরুষশাসিত সমাজব্যবস্থা ও মহিলাদের প্রতি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাবে যৌতুক অব্যাহত রয়েছে। পিতৃতান্ত্রিক ও পুরুষ শাসিত সমাজ ব্যবস্থায় মহিলাদের সামাজিক মর্যাদা ও সম-অধিকারের স্বীকৃতি না থাকায়, যৌতুক প্রথার মাধ্যমে তা পূরণের প্রয়াস চালানো হয়। যার প্রভাবে সমাজে যৌতুক প্রথা বিস্তার লাভ করছে।

যৌতুক

যৌতুকের প্রথার কারণ

পুরুষশাসিত সমাজব্যবস্থা ও মহিলাদের প্রতি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাবে যৌতুক অব্যাহত রয়েছে। পিতৃতান্ত্রিক ও পুরুষ শাসিত সমাজ ব্যবস্থায় মহিলাদের সামাজিক মর্যাদা ও সম-অধিকারের স্বীকৃতি না থাকায়, যৌতুক প্রথার মাধ্যমে তা পূরণের প্রয়াস চালানো হয়। যার প্রভাবে সমাজে যৌতুক প্রথা বিস্তার লাভ করছে।

আভিজাত্য ও সামাজিক মর্যাদা লাভের আকাঙ্খা অনেক সময় যৌতুক প্রথাকে প্রভাবিত করে। আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের ফলে অনেকে বিপুল পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়া সত্ত্বেও বংশমর্যাদা ও আভিজাত্যের অভাবে সমাজের উঁচু শ্রেণীতে উঠতে পারছে না। এসব নব্য ধনীরা অভিজাত শ্রেণীভুক্ত হওয়ার আশায় বিপুল যৌতুকের বিনিময়ে অভিজাত ও বংশ মর্যাদাসম্পন্ন পরিবারে অথবা উচ্চশিক্ষিত বরের নিকট কন্যা বিয়ে দিয়ে থাকে অথবা নিজের সন্তানকে বিবাহ করায়। এরূপ মানসিকতা যৌতুক বৃদ্ধির সহায়ক।

যৌতুক

যৌতুকের প্রথার কারণ

যৌতুক প্রদানের ক্ষেত্রে অর্থহীন অহমিকাবোধ ও অসম প্রতিযোগিতার প্রভাব যৌতুকের কারণ রূপে বিরাজ করছে। ধনী ও নব্যধনী যারা সম্পদের অসম বণ্টন ও দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করে রাতারাতি সম্পদশালীতে পরিণত হয়েছে, তাদের মধ্যে যৌতুক প্রদানের যে প্রতিযোগিতা ও অর্থহীন অহমিকাবোধ রয়েছে, তা বাংলাদেশে যৌতুক প্রথাকে প্রসারিত করছে। এসব সম্পদশালী ব্যক্তিদের জামাই ক্রয়ের প্রতিযোগিতা যৌতুকের দাবিকে বৃদ্ধি করছে।

সমাজে শিক্ষিত ও স্বল্পশিক্ষিত ছেলে এবং তার অভিভাবকদের নগদ প্রাপ্তির লোভ এবং সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভের উপায় হিসেবে অনেক সময় যৌতুক প্রথাকে গণ্য করা হয়। যার প্রভাবে সমাজে যৌতুকের প্রবনতা বৃদ্ধি পায়। এজন্য বরপক্ষের আর্থিক অস্বচ্ছলতা অনেকাংশে দায়ী।

যৌতুক

যৌতুকের প্রথার কারণ

বাংলাদেশে যৌতুকের অন্যতম কারণ নারীদের পরনির্ভরশীল জীবনযাপন ও নিরাপত্তার অভাব। বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থায় নারীদের কর্মসংস্থানের অভাব থাকায় তাদের পরনির্ভরশীল জীবনযাপন করতে হয়। সনাতন গ্রামীণ জনপদে নারীদের সামাজিক মর্যাদা নেই বললে চলে। এমন কি বিয়ের ব্যাপারেও তাদের মতামতের কোন মূল্য দেয়া হয় না। নারীদের পরনির্ভরশীল ও মর্যাদাহীন জীবনধারা যৌতুক প্রবণতা সৃষ্টির সহায়ক।

কনের চেহারায় সৌন্দর্যের অভাব অনেকক্ষেত্রে যৌতুকের কারণ হিসেবে প্রভাব বিস্তার করে। দৈহিক খুঁত, অধিক বয়স, সৌন্দর্যের অভাব ইত্যাদি কারণে পিতামাতা প্রচুর যৌতুকের বিনিময়ে কন্যাকে পাত্রস্থ করতে বাধ্য হয়। যে সব পরিবারে কন্যা একমাত্র সন্তান অথবা অধিক পুত্র সন্তানের মধ্যে একমাত্র কন্যা সন্তান, এক্ষেত্রে পিতামাতা এবং ভাইদের আপন স্নেহের নিদর্শন স্বরূপ বিপুল যৌতুক প্রদানের মাধ্যমে কনের বিয়ে দেয়া হয়। এরূপ প্রবণতা সমাজে যৌতুক প্রথা প্রসারের সহায়ক।

যৌতুক

যৌতুকের প্রথার কারণ

সামাজিক দুর্নীতি এবং অনুপার্জিত আয়ের প্রতিক্রিয়া হিসেবে যৌতুক প্রবনতা সমাজে বিরাজ করছে। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার পরিপ্রেক্ষিতে দুর্নীতি, ঘুষ, চোরাকারবার, জালিয়াতি, প্রতারণা ইত্যাদি অবৈধ উপায়ের মাধ্যমে কালো টাকার মালিকানার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হলো যৌতুক প্রথা। অবৈধ কালো টাকা যৌতুক প্রথা বিস্তারের জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দায়ী। নারী সমাজের অর্থনৈতিক পরনির্ভরশীলতা ও অশিক্ষা, যুব-সমাজের নৈতিক ও সামাজিক চেতনাবোধের অভাব যৌতুক প্রসারের অন্যতম কারণ। যৌতুক প্রথা বাংলাদেশের শুধু সামাজিক সমস্যাই নয়, অনেক সমস্যা সৃষ্টির প্রধান কারণও বটে। যৌতুক প্রথা কোন বিচ্ছিন্ন সমস্যা নয়, অন্যান্য সামাজিক সমস্যার সাথে এটি অবিচ্ছিন্নভাবে সম্পর্কিত।

যৌতুক

যৌতুক পরিস্থিতি

বাংলাদেশের যৌতুক সংশ্লিষ্ট নারী নির্যাতন এবং নারীর প্রতি সহিংসতার ঘটনার সঠিক পরিসংখ্যান পাওয়া কঠিন। পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ এবং বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক প্রতিবেদন হতে যৌতুকের কারণে নারী নির্যাতন ও নারীর প্রতি সহিংসতার ব্যাপকতা সম্পর্কে ধারণা করা যায়। নারীর প্রতি সহিংসতা ও নির্যাতনের বেশিরভাগ যৌতুকের কারণে ঘটে। যৌতুক সংশ্লিষ্ট নারী নির্যাতনের সব ঘটনা সামাজিক ও পারিবারিক কারণে প্রকাশ হয় না। এখানে সংবাদপত্র এবং অন্যান্য উৎস হতে প্রাপ্ত পরিসংখ্যান তুলে ধরা হলো। বাংলাদেশের বিগত এবং বর্তমান সময়ের পরিসংখ্যান হতে যৌতুক পরিস্থিতির অব্যাহত চিত্র স্পষ্ট হয়ে উঠে।

বাংলাদেশ আইন ও শালিশ কেন্দ্রের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০০৫ সালের ১৮০৬টি সহিংসতার ঘটনার মধ্যে যৌতুকের কারণে নির্যাতনের ঘটনা ছিল ৩৫৬টি। ২০০৯ সালে ১১১০ টি নির্যাতনের ঘটনার মধ্যে ২৮৫টি ছিল যৌতুক সংশ্লিষ্ট নির্যাতন।

যৌতুক

যৌতুক পরিস্থিতি

২০০৯ সালে যৌতুকের কারণে ১৯৪ জনকে হত্যা করা হয়। পারিবারিক ও গৃহ সহিংসতার অধিকাংশ যৌতুকের কারণে সংঘটিত হয়। বাংলাদেশ পুলিশ সদর দপ্তরের তথ্যানুযায়ী নারী নির্যাতন সংশ্লিষ্ট কেসের সংখ্যা ২০০৭ সালে ছিল ১৪,২৫০টি। ২০১০ সালে ছিল প্রায় ১৬,২১২টি এবং ২০১১ সালে তা প্রায় দ্বিগুণ হয়ে ২৮,২৫৬ টিতে পৌঁছে। এসব কেসের অধিকাংশ যৌতুক সংশ্লিষ্ট। ২০১২ সালে যৌতুকসহ অন্যান্য নারী নির্যাতন কেসের সংখ্যা ছিল ১৯,৪২২ টি।১০
নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০১৫ সালে যৌতুকের জন্য নারী নির্যাতনের কারণে সারাদেশে ৬৬০৭টি মামলা হয়েছে। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ আইন ও সালিশ কেন্দ্র এবং আমরাই পারি পারিবারিক নির্যাতন প্রতিরোধ জোটের ২০১৫ সালের পরিসংখ্যান হতে জানা যায় যৌতুকের কারণে হত্যা ১৯২ জনকে হত্যা করা হয়েছে। বাংলাদেশে মহিলা পরিষদ ১৪টি সংবাদপত্রে প্রকাশিত তথ্যের ভিত্তিতে ২০১৬ সালের পরিসংখ্যান প্রকাশ করেছে। ২০১৬ সালে যৌতুকের কারণে ১৭৩ জন খুন হয়েছে। পাঁচ বছরে হত্যার শিকার হয়েছে। ১১৫১ জন নারী।

যৌতুক

যৌতুক পরিস্থিতি

উপরোক্ত পরিসংখ্যান হতে স্পষ্ট হয়ে উঠে যৌতুক সংশ্লিষ্ট নারী নির্যাতন অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশে গ্রামে গঞ্জে অসংখ্য নারী যৌতুকের কারণে সহিংসতা ও নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। যেগুলো সামাজিক ও পারিবারিক মর্যাদার ভয়ে অথবা নিরাপত্তাজনিত কারণে প্রকাশ করা হয় না। এজন্য বাংলাদেশে যৌতুক পরিস্থিতি সংশ্লিষ্ট সঠিক পরিসংখ্যান পাওয়া কঠিন। কারণ যৌতুকের দাবিকে কেন্দ্র করে যখন নারী নির্যাতন সংগঠিত হয়, তখনই তা প্রকাশ পায়।

যৌতুক

যৌতুক প্রথার প্রভাব

যৌতুক মূলত অর্থনৈতিক সমস্যা হলেও যৌতুকের দাবি বহু সামাজিক এবং মানসিক সমস্যার জন্ম দেয়। যৌতুক প্রথা অমানবিক ও কলঙ্কিত নিষ্ঠুর সামাজিক অনাচার হিসেবে সমাজের সর্বস্তরে বিরাজ করছে। যৌতুকের দাবিকে কেন্দ্র করে বিয়ের পর দাম্পত্য কলহ, স্ত্রী নির্যাতন, স্ত্রী হত্যা, বিবাহ বিচ্ছেদ প্রভৃতি ঘটনা বাংলাদেশে ঘটছে। যৌতুকের প্রভাবে সমাজের মৌলিক প্রতিষ্ঠান পরিবারের শান্তি ও নিরাপত্তা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়। নারী নির্যাতনের অমানবিক প্রথা হলো যৌতুক। ২০১২ সালে যৌতুকের কারণে নির্যাতন, এসিড, অপহরণ, ধর্ষণ, হত্যার শিকার হয় ১৯ হাজার ৪২২ জন।" কন্যাদায়গ্রস্ত দরিদ্র ও নিম্নবিত্ত পিতা-মাতা যৌতুকের দাবি মেটাতে গিয়ে যথাসর্বস্ব বিক্রি করে দুঃস্থ ও নিঃস্ব হয়ে পড়ছে। যার প্রভাবে সমাজে দরিদ্রতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। অন্যদিকে, সমাজে ভিক্ষাবৃত্তি, অপরাধ প্রবণতা, দুর্নীতি প্রভৃতি সমস্যার পেছনে যৌতুক প্রথার প্রত্যক্ষ প্রভাব রয়েছে।সাইট

যৌতুক

যৌতুক প্রথার প্রভাব

যৌতুকের লোভে গ্রামীণ সনাতন সমাজে বাল্যবিবাহ এবং বর কনের বয়সের ব্যাপক পার্থক্য থাকা সত্বেও বিবাহ সম্পন্ন হচ্ছে। এতে অপরিপক্ক মাতৃত্ব ও পিতৃত্ব লাভের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটি যেমন জনসংখ্যা বৃদ্ধির সহায়ক, তেমনি সন্তান-সন্ততিদের সুষ্ঠু সামাজিকীকরণের অন্তরায়। অন্যদিকে যৌতুকের দাবি পূরণের ব্যর্থতা মেয়েদের বিবাহের অন্যতম প্রতিবন্ধক হিসেবে প্রভাব বিস্তার করছে। যৌতুকের লোভে অনেক শিক্ষিত ছেলে অথবা উচ্চশিক্ষার সুযোগ লাভের আশায় অনেক সময় অশিক্ষিত ও অপেক্ষাকৃত কম সুন্দরী মেয়ে বিয়ে করে। যৌতুকের অর্থে আর্থিক ও সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হবার পর দাম্পত্য কলহের শিকার হয়ে প্রায়শ স্ত্রীকে অকালে স্বামীর হাতে প্রাণ দিতে হয় অথবা অব্যাহত নির্যাতন সইতে হয়।

নারীদের সামাজিক মর্যাদা ও অধিকার লাভের প্রধান প্রতিবন্ধক হচ্ছে যৌতুক। অন্যদিকে হয়রানি ও অপমানিত হচ্ছে অনেক পুরুষ, যে পুরুষ কন্যার পিতা। সর্বনাশা যৌতুকের নিষ্পেষণে বাংলাদেশের নারী-পুরুষ উভয়ে মানসিক ও সামাজিক চাপ ভোগ করছে।

যৌতুক

যৌতুক প্রথার প্রভাব

বাংলাদেশে আত্মহত্যা প্রবণতা বৃদ্ধির অন্যতম সহায়ক কারণ যৌতুক প্রথা। বাংলাদেশে বেশিরভাগ আত্মহত্যার কারণ দাম্পত্য কলহ ও দারিদ্র্য। যৌতুকের দাবিকে কেন্দ্র করে বেশিরভাগ আত্মহত্যার ঘটনা ঘটে।" যৌতুক প্রথার দুষ্টচক্র ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে বহুবিধ সমস্যা সৃষ্টি করছে। এজন্য সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে যৌতুকের মতো অমানবিক ও নির্যাতনমূলক প্রথা উচ্ছেদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। ১৯৮০ সালে বাংলাদেশে যৌতুক বিরোধী আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়া নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ এর ১১ নং ধারায় যৌতুক সংশ্লিষ্ট অপরাধের শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে।

যৌতুক মোকাবেলায় সমাজকর্মীর ভূমিকা

বাংলাদেশে যৌতুকের প্রভাব এবং যৌতুকের কারণে নারী নির্যাতনের কোন ঘটনা ঘটার পর দেশব্যাপী আন্দোলন গড়ে উঠে। এসব আন্দোলন কোন কোন ক্ষেত্রে সফল হলেও সবক্ষেত্রে তেমন ফল বয়ে আনতে পারে না। সমাজকর্মের অন্যতম সহায়ক পদ্ধতি হলো সামাজিক কার্যক্রম (Social action)। সমাজকর্মের জ্ঞান, নীতি ও দর্শনের ভিত্তিতে সামাজিক সমস্যা মোকাবেলায় সামাজিক প্রথা-প্রতিষ্ঠান, আইন, নীতি ইত্যাদির পরিবর্তন ও সংশোধনের লক্ষ্যে পরিচালিত যৌথ প্রচেষ্টা হলো সামাজিক কার্যক্রম। সামাজিক কার্যক্রম বাস্তবায়নের কৌশলগুলো হলো যোগাযোগ (Communication), তথ্য ও শিক্ষামূলক প্রচারণা (Information and educational publicity), প্রচলিত আইনের উন্নয়ন (Promotion of legislation) এবং সর্বস্তরের জনগণের প্রতিনিধি, ধর্মীয় দল, শ্রমিক সংগঠন ও সমাজকর্মীদের সমন্বয়ে আইন পরিষদ (Legislation council) গঠন। যৌতুক সমস্যা মোকাবেলায় সমাজকর্মীরা সামাজিক কার্যক্রমের উপরোক্ত কৌশলগুলো প্রয়োগ করে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করতে পারেন।

যৌতুক মোকাবেলায় সমাজকর্মীর ভূমিকা

সামাজিক কার্যক্রমের যোগাযোগ কৌশল প্রয়োগ করে যৌতুক সম্পর্কে জনগণের চিন্তাভাবনা, মনোভাব, দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের মাধ্যমে যৌতুক বিরোধী জনমত গড়ে তোলা যায়। কার্যকর যোগাযোগ কৌশলের মাধ্যমে সমাজ সচেতন ব্যক্তিবর্গ, আনুষ্ঠানিক-অনানুষ্ঠানিক নেতাদের যৌতুকের প্রভাব সম্পর্কে সচেতন করা যায়। তথ্য ও শিক্ষামূলক প্রচারণা যৌতুক বিরোধী সামাজিক পরিবেশ গঠনের সহায়ক। সামাজিক সচেতনতা হলো যৌতুক মোকাবেলার কার্যকর উপায়। যৌতুক বিরোধী সেমিনার, আলোচনা সভার আয়োজন, সমিতি, প্রচারপত্র বিলি, সংবাদপত্র, রেডিও, টিভি প্রভৃতি গণমাধ্যমে প্রচারণা চালানোর ক্ষেত্রে সমাজকর্মীরা ভূমিকা পালন করতে পারে।

যৌতুক

যৌতুক মোকাবেলায় সমাজকর্মীর ভূমিকা

সমাজকর্ম অনুশীলনের গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হলো ক্ষমতায়ন। সমাজকর্ম অনুশীলনে ক্ষমতায়ন হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ব্যক্তি, পরিবার, দল ও সমষ্টিকে তাদের জীবনকে প্রভাবিত করার শক্তি অর্জনে সাহায্য করা হয়। ক্ষমতাহীন মানুষকে নিজের জীবনধারা নিয়ন্ত্রণে সেবা প্রদানের ক্ষমতা অর্জনে সহায়তা করাই ক্ষমতায়ন। যৌতুক নিয়ন্ত্রণ ও মোকাবেলায় নারী ক্ষমতায়ন কার্যকর কৌশল। নারী জীবনধারা নিয়ন্ত্রণের সিদ্ধান্ত গ্রহণে যেমন বিবাহের ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হলে তাদের ক্ষমতায়ন প্রয়োজন। নারীর ক্ষমতায়নে, সমাজকর্মের জ্ঞান, দক্ষতা ও নীতি প্রয়োগের মাধ্যমে সমাজকর্মীরা ভূমিকা পালন করতে পারে। বাংলাদেশে যৌতুক নিরোধ আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। আইন সম্পর্কে জনগণের অজ্ঞতা ও সচেতনতার অভাবে আইনের প্রয়োগ হচ্ছে না। সমাজকর্মীরা যৌতুক বিরোধী আইন বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজকর্ম ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৩ – সামাজিক সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মের অনুশীলন

টপিক – ০৭ বাল্যবিবাহ

টপিক ০৭: বাল্যবিবাহ

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

বাল্যবিবাহ

বিবাহ একটি সর্বজনীন সামাজিক প্রতিষ্ঠান। বিবাহ পরিবার গঠনের সমাজ অনুমোদিত ও স্বীকৃত প্রথা। পরিবারের স্থায়িত্ব ও সামাজিক স্বীকৃতির ভিত্তি হলো বিবাহ। মানুষের পারস্পরিক সামাজিক সম্পর্ক, সামাজিক পরিচিতি ও সামাজিক মর্যাদার প্রধান নির্ধারক হলো বিবাহ। বিবাহ হলো নারী পুরুষের মধ্যে এমন এক চুক্তির সম্পর্ক, যার মাধ্যমে তারা স্বামী স্ত্রীরূপে যৌন সম্পর্ক স্থাপন, সন্তান জন্মদান এবং পরিবার গঠনের সামাজিক, ধর্মীয় ও আইনগত স্বীকৃতি লাভ করে। সাধারণত বেশির ভাগ পুরুষ ৩৫ বছর এবং মহিলা ২৫ বছর বয়সের আগেই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। বিবাহ করার মানদন্ড হলো বয়স। জাতীয় সংসদে পাসকৃত বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন অনুযায়ী বাংলাদেশে বিয়ের সর্বনিম্ন বয়স মেয়েদের জন্য ১৮ বছর এবং ছেলেদের জন্য ২১ বছর। ২০১৬ সালের ২৫ নভেম্বর বাংলাদেশ সরকার মেয়েদের জন্য বিশেষ ক্ষেত্রে পিতামাতার সম্মতি ও আদালতের অনুমতিক্রমে ১০ বছরের নিচে বিয়ের অনুমতিসহ বিয়ের বয়স ১৮ বচর নির্ধারণ করেছেন বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭তে বিশেষ প্রেক্ষাপটে ১৮ বছর আগেই বিয়ে করার সুয়োগ রাখা হয়েছে।

বাল্যবিবাহ

বাল্যবিবাহের ধারণা

বাল্যবিবাহ একটি বৈবাহিক বিষয়। তবে দেশ ভেদে বাল্যবিবাহের সংখ্যার মধ্যে পার্থক্য হয়। বাল্যবিবাহ বলতে অপ্রাপ্ত বয়স্কদের বিবাহকে বুঝানো হয়। সাধারণত বয়সকে বিবাহের মাপকাঠি ধরে বাল্যবিবাহ ধারণাটি ব্যাখ্যা করা হয়। বাল্যবিবাহ ধারণা ব্যাখ্যা করার আগে শিশু বা কিশোর কিশোরীর সংজ্ঞা উল্লেখ করা প্রয়োজন।

জাতিসংঘ সর্বজনীন শিশু অধিকার সনদ এবং বাংলাদেশ জাতীয় শিশু নীতিতে (২০১১) শিশু বলতে ১৮ বছরের কম বয়সী সকল ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে। অন্যদিকে কিশোর-কিশোরী বলতে ১৪ বছর থেকে ১৮ বছরের কম বয়সী শিশুদেরকে বুঝানো হয়েছে। বাংলাদেশে শিশু আইন ২০১৩ অনুযায়ী ১৮ বছরের নিচের বয়সের সকলে শিশু হিসেবে গণ্য। সুতরাং সাধারণভাবে আইনগত দিক হতে বলা যায়, ১৮ বছরের নিচের কোন মেয়ে অথবা ছেলের বিবাহ সম্পন্ন হলে তাকে বাল্যবিবাহ বলা হয়।

বাল্যবিবাহ

বাল্যবিবাহের ধারণা

বাল্যবিবাহ একটি সামাজিক ব্যাধি। এটি ঐতিহ্যগতভাবে সমাজে চলে আসছে। বাল্যবিবাহের একক কারণ চিহ্নিত করা কঠিন। বাল্যবিবাহের সঙ্গে মানুষের সহজাত প্রবণতা, ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি দিক জাড়িত। অজ্ঞতা, কুসংস্কার, শিক্ষার অভাব ইত্যাদি বিষয়গুলো বাল্যবিবাহের কারণ হিসেবে প্রভাব বিস্তার করে।

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (WHO), এবং জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল (UNFPA) বাল্যবিবাহের জন্য যে সব কারণ চিহ্নিত করেছে, সেগুলোর ভিত্তিতে বাল্যবিবাহের কারণগুলো সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো।

• বাল্যবিবাহ ঐতিহ্যগতভাবে সামাজিক আদর্শ ও মূল্যবোধ (Social Norms and Values) হিসেবে সমাজে স্বীকৃত ছিল, বর্তমানেও তা অব্যাহত রয়েছে।

• লিঙ্গ বৈষম্য হলো বাল্যবিবাহের বিশেষ করে ১৮ বছরের নিচের বয়সের মেয়েদের বিবাহের মূল কারণ।

• মেয়েদের বাল্যবিবাহ পরিবারের আর্থিক সুবিধা ও অস্তিত্ব রক্ষার কৌশল হিসেবে ব্যবহার করা হয়। পরিবারের সদস্য সংখ্যা কমানোর মাধ্যমে আর্থিক বোঝা লাঘবের কৌশল হিসেবে মেয়েদের বাল্যবিবাহে পিতামাতা আগ্রহী হয়। ১৩ পরিবারের সদস্য সংখ্যা কমানোর মাধ্যমে খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, প্রভৃতি ব্যয় হ্রাসের জন্য মেয়েদের বাল্যবিবাহের ব্যবস্থা করে ।

বাল্যবিবাহ

বাল্যবিবাহের ধারণা

• সামাজিক চাপেও অনেক সময় কন্যা সন্তানের বাল্যবিবাহ দিতে পিতা মাতা বাধ্য হন। অনেক সংস্কৃতিতে বিশ্বাস করা হয় কন্যা সন্তান প্রজনন ক্ষমতা অর্জনের (Puberty) আগে মেয়েদের বিবাহ পরিবারের জন্য অনেক পূণ্য ও মঙ্গল বয়ে আনবে ।

• অনেক সমাজে যৌন সহিংসতা, যৌন আক্রমণ এবং সামাজিক মর্যাদা হানির পরিস্থিতি হতে রক্ষার কৌশল হিসেবে পিতামাতা বাল্যবিবাহের ব্যবস্থা করেন। এমন অনেক পরিবার রয়েছে যারা বাল্যবিবাহকে মেয়েদের রক্ষায় একমাত্র উপায় হিসেবে বিবেচনা করে ।

জাতিসংঘ জরিপের তথ্যানুযায়ী — বাল্যবিবাহ যৌন সহিংসতা হতে কন্যাদের রক্ষার একমাত্র উপায়'—পিতা মাতার এরূপ বিশ্বাসের সত্যতা পাওয়া যায়। দারিদ্র্য, ঐতিহ্য, লিঙ্গ বৈষম্য, কন্যা শিশুদের প্রতি সহিংসতা ইত্যাদি বাল্যবিবাহের মূল কারণ রূপে গণ্য। গ্রামীণ সনাতন জনপদে যেখানে মেয়েদের ভবিষ্যত অত্যন্ত সীমিত, সেখানে বাল্যবিবাহ সাধারণ ঘটনা। পিতা মাতা এরূপ বিবাহের ব্যবস্থা করেন এবং কনের কোন স্বাধীনতা বা বক্তব্য থাকে না ।

বাল্যবিবাহ

বাল্যবিবাহের ধারণা

বাংলাদেশে আবহাওয়া ও খাদ্যভাসের পরিপ্রেক্ষিতে নর-
নারী অপেক্ষাকৃত কম বয়সে সন্তান প্রজনন ক্ষমতা অর্জন করে। বাংলাদেশে অতিমাত্রায় শ্বেতসার (Carbohydrates) যেমন ভাত, গম, আলু, প্রভৃতি খাদ্য গ্রহণ এবং কম পরিমাণ আমিষ (Protein) যেমন মাছ, মাংস, ডিম প্রভৃতি স্বল্পমাত্রায় গ্রহণ প্রজনন ক্ষমতাকে প্রভাবিত করে। বাংলাদেশের জনগণের খাদ্যে আমিষের প্রভাব এবং শ্বেতসারের আধিক্য অল্প বয়সে প্রজনন ক্ষমতা অর্জনের সহায়ক। জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল (UNFPA) বিশ্ব জনসংখ্যা রিপোর্ট ১৯৯৮ এর তথ্যানুযায়ী অল্প বয়স্ক মেয়েদের প্রজনন ক্ষমতা শ্রীলংকার মেয়েদের চেয়ে বাংলাদেশের মেয়েদের পাঁচগুন বেশি।

বাল্যবিবাহ

বাল্যবিবাহের ধারণা

নাতিশীতোষ্ণ মৌসুমী অঞ্চলের আবহাওয়ায় এবং খাদ্যাভাসের প্রভাবে বাংলাদেশের মেয়েরা ১৮ বছরের কম বয়সে প্রজনন ক্ষমতা অর্জন করে। দরিদ্র ও নিম্নশ্রেণির জনগোষ্ঠী বিশেষ করে গ্রামীণ সমাজে মেয়েদের সন্তান ধারণ ক্ষমতা অর্জনের পর তাড়াতাড়ি বিবাহ দেয়ার প্রবণতা বাল্যবিবাহের কারণ হিসেবে প্রভাব বিস্তার করে।

প্রজনন (Fecundity) সামর্থ্য অর্জিত হবার পরিপ্রেক্ষিতে মেয়েদের দৈহিক পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করে পিতামাতা মেয়েদের বিবাহ দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। বয়স তেমন বিবেচনা করা হয় না। বাংলাদেশে জনমিতি ও স্বাস্থ্য জরিপ ২০১১ এর তথ্যানুযায়ী ১৮ বছর পূর্ণ হবার আগে ৬৬ শতাংশ কিশোরীর বিয়ে হয় এবং ১৯ বছরের মধ্যে তাদের তিনজনের মধ্যে একজন গর্ভধারণ করে। জনমিতি জরিপ ২০১৭-১৮ অনুযায়ী বিবাহিত ২০-২৪ বছরের নারীদের মধ্যে ১৮ বছর পূর্ণ হওয়ার আগে শহরে ৫৪.৬ এবং গ্রামে ৬০.৭শতাংশের বিবাহ হয়।

বাংলাদেশে বাল্যবিবাহের বিশেষ করে মেয়েদের বাল্যবিবাহের ক্ষেত্রে ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাবের প্রভাব রয়েছে। বাংলাদেশের ধর্মভীরু মুসলমানগণ সন্তানদের বিবাহ প্রদানকে পবিত্র কাজ বলে মনে করে। ফলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিশেষকরে মেয়েদের বিয়ে দিয়ে নিজেদের দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হন। গ্রামীণ জনপদে মেয়েদের বাল্যবিবাহের ক্ষেত্রে ধর্মীয় মনোভাবের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়।

বাল্যবিবাহ

বাল্যবিবাহের ধারণা

নেতিবাচক সামাজিক পরিবেশ এবং মেয়েদের নিরাপত্তাহীনতা বাংলাদেশে বাল্যবিবাহের অন্যতম কারণ। নারীর প্রতি সহিংসতা, অপহরণ, নারী পাচার, ধর্ষণ, ইভটিজিং প্রভৃতি নেতিবাচক সামাজিক পরিবেশে মেয়েদের নিরাপত্তা নিয়ে অভিভাবক শ্রেণি উদ্বিগ্ন থাকেন। এমতাবস্থায় তাড়াতাড়ি মেয়েদের বিবাহ দেয়াকে নিরাপদ বলে পিতা-মাতা বিবেচনা করেন। মেয়েদের প্রতি সমাজের নেতিবাচক মনোভাব ও নেতিবাচক আচরণ বাল্যবিবাহের জন্য বিশেষভাবে দায়ী। মেয়েদের স্কুল, কলেজে পাঠানোর চেয়ে বিবাহের ব্যবস্থা করাকে নিরাপদ বলে অভিভাবকগণ মনে করেন।

বাল্যবিবাহ

বাল্যবিবাহের ধারণা

বাংলাদেশে বাল্যবিবাহের ক্ষেত্রে যৌতুক প্রথার প্রভাব রয়েছে। যৌতুক প্রদান থেকে বাঁচার উপায় হিসেবে অনেক সময় কম বয়সে মেয়েদের বিবাহ দেওয়া হয়। বাল্যবিবাহের প্রবণতা বৃদ্ধিতে যৌতুক প্রথার প্রভাব রয়েছে।

বাল্যবিবাহ হলো লিঙ্গভিত্তিক নারী পুরুষের অসম সম্পর্কের বহিঃপ্রকাশ। নারী পুরুষের লিঙ্গভিত্তিক অসম সম্পর্ক ঐতিহাসিক ও সামাজিকভাবে স্বীকৃত। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় সামাজিক রীতি নীতি, প্রাতিষ্ঠানিক বিধি-বিধান এবং নিয়ম কানুন নারী পুরুষের অসম সম্পর্কের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। বিবাহের বয়সের ক্ষেত্রে পুরুষের বয়স নারীর চেয়ে বেশি হওয়া সামাজিক ও আইনগতভাবে স্বীকৃত। যেমন- আইন অনুযায়ী নারীর বিবাহের বয়স ১৮ বছর ধরা হলেও পুরুষের ২১ বছর ধরা হয়েছে। অসম সামাজিক সম্পর্কের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারী পুরুষের অসম অবস্থান নারীর উপর পুরুষের ক্ষমতা প্রয়োগ ও প্রাধান্য বিস্তারে সহায়তা করছে। পুরুষদের সহজাত প্রবণতা হলো নিজের চেয়ে কম বয়সের মেয়ে বিবাহ করা। নারী পুরুষের অসম সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা ও রীতি নীতিতে মেয়েদের বাল্যবিবাহ মেনে নেওয়ার স্বাভাবিক প্রবণতা বাল্যবিবাহের অন্যতম প্রধান কারণ।

বাল্যবিবাহ

বাল্যবিবাহের ধারণা

বিভিন্ন গবেষণার তথ্যানুযায়ী অজ্ঞতা ও নিরক্ষরতা বাল্যবিবাহের প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতার কারণে ব্যক্তিগত ও সমাজ জীবনে বাল্যবিবাহের প্রভাব সম্পর্কে জনগণ সচেতন নয়। অজ্ঞ ও নিরক্ষর পিতা মাতা মেয়েদের বয়স ১৮ বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই বিবাহের ব্যবস্থা করে। বিশেষ করে গ্রামীণ সনাতন জনপদে ও চরাঞ্চলের জনগোষ্ঠীর মধ্যে বাল্যবিবাহের পেছনে অজ্ঞতা ও নিরক্ষরতা বিশেষভাবে দায়ি।

বাংলাদেশে সর্বজনীন জন্মনিবন্ধন ব্যবস্থা এখনো গড়ে উঠেনি। এতে বয়স নির্ধারণে জটিলতা দেখা দেয়। বিশেষ করে মেয়েদের বিবাহের সময় ১৮ বছর দেখিয়ে বিবাহ নিবন্ধন করানো হয়। জাতিসংঘ শিশু তহবিল প্রকাশিত, বিশ্ব শিশু পরিস্থিতি ২০১২ এর তথ্যানুযায়ী জন্ম নিবন্ধনের হার মাত্র ১০ শতাংশ। অনেক সময় নবম দশম শ্রেণির ছাত্রীদের ১৮ বছর বয়স দেখিয়ে বিবাহ নিবন্ধন করানো হয়। জন্মনিবন্ধন এবং বিবাহ নিবন্ধনের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতার অভাব বাল্যবিবাহের কারণ হিসেবে প্রভাব বিস্তার করে।

বাল্যবিবাহ

বাল্যবিবাহের ধারণা

বাল্যবিবাহ একটি বিশ্বব্যাপী সমস্যা। বিশেষকরে দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দক্ষিণ এশিয়া এবং আফ্রিকান দেশগুলোতে মেয়েদের বাল্যবিবাহ স্থায়ী সামাজিক অনাচারে পরিণত হয়েছে। জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিলের তথ্যানুযায়ী ২০১১ থেকে ২০২০ সালের মধ্যে ১৪০ মিলিয়ন কন্যাশিশু শিশুকনে (Child bride) পরিণত হবে। বার্ষিক ১৪.২ মিলিয়ন অর্থাৎ দৈনিক ৩৯ হাজার বাল্যবিবাহ অনুষ্ঠিত হবে।

জাতিসংঘ শিশু তহবিল প্রকাশিত বিশ্ব শিশু পরিস্থিতি ২০১০ এর তথ্যানুযায়ী দক্ষিণ এশিয়া এবং আফ্রিকার সাবসাহারা অঞ্চলে বাল্যবিবাহ সাধারণ বিবাহ হিসেবে গণ্য। উন্নয়নশীল দেশে এক তৃতীয়াংশ মহিলা বাল্যবিবাহের শিকার। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) মিডিয়া সেন্টার প্রদত্ত তথ্যানুযায়ী বাল্যবিবাহের উচ্চহার বিশ্বের এরূপ ১০টি দেশ হলো নাইজেরিয়া (৭৫ শতাংশ বাল্যবিবাহ); সেন্টাল আফ্রিকা (৬৮ শতাংশ); বাংলাদেশ (৬৬ শতাংশ); ঘানা (৬৩ শতাংশ); মোজাম্বিক (৫৬ শতাংশ); মালি (৫৫ শতাংশ); দক্ষিণ সুদান (৫২ শতাংশ) এবং মাওয়ালী (৫০ শতাংশ)। তবে সংখ্যার দিক হতে জনসংখ্যার কারণে ভারতে সর্বাধিক সংখ্যক বাল্যবিবাহ সংঘটিত হয়।

বাল্যবিবাহ

বাল্যবিবাহের ধারণা

বাংলাদেশ ধর্মীয় মূল্যবোধ ও অনুশাসন প্রভাবিত মুসলিম প্রধান দেশ। ধর্মীয় মূল্যবোধ এবং অনুশাসনের প্রভাবে বিবাহ প্রথা প্রভাবিত। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট আলোচনা করলে দেখা যায় বাল্যবিবাহের প্রচলন এদেশে ঐতিহ্যগতভাবে চলে আসছে। আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন এবং শিক্ষা ও জ্ঞানের প্রসারের পরিপ্রেক্ষিতে বাল্যবিবাহের হার হ্রাস পাচ্ছে। তবে নারী পুরুষের বিবাহের বয়সের মধ্যে বৈষম্য অব্যাহত রয়েছে। জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল (UNFPA) এর বিশ্ব জনসংখ্যা পরিস্থিতি ২০১২ এর তথ্যানুযায়ী বাল্যবিবাহ বেশি এমন ২০টি দেশের তালিকায় বাংলাদেশের স্থান তৃতীয়।

বাংলাদেশের বাল্যবিবাহের পরিস্থিতি বিভিন্ন পরিসংখ্যান হতে স্পষ্ট হয়ে উঠে। জাতিসংঘ শিশু তহবিল (UNICEF) প্রকাশিত বিশ্ব শিশু পরিস্থিতি ২০১২ এর তথ্যানুযায়ী ২০০০-২০১২ সালের মধ্যে ১৫ বছরের আগে যেসব মেয়েদের প্রথম বারের মতো বিয়ে হয়েছে তাদের শতকরা হার ৩২ ভাগ এবং ১৮ বছরের আগে যেসব মেয়েদের বিয়ে হয়েছে তাদের শতকারা ৬৬ ভাগ।" বাংলাদেশে বাল্যবিবাহের লক্ষ্যনীয় বৈশিষ্ট্য হলো এটি মেয়েদের ক্ষেত্রে অধিক পরিলক্ষিত হয়। ২০১০ সালে ১৫-১৯ বছর বয়সের মেয়েদের বিবাহের হার যেখানে ২১.৯০ ভাগ, ছেলেদের ক্ষেত্রে এ হার ছিল ৩.০৬ ভাগ।

বাল্যবিবাহ

বাল্যবিবাহের পরিস্থিতি

বাংলাদেশে এক তৃতীয়াংশ নারীর বিয়ে হয় ১৫-১৯ বছর বয়সে। ২০০১ সালে বাল্যবিবাহের হার ছিল ৩৭ শতাংশ। ২০১১ সালে তা কমে ৩২ শতাংশে পৌছে।১৭ বাংলাদেশে মহিলাদের আইনগত বয়স ১৮ বছর। ২০১৭-২০১৮ জনমিতি স্বাস্থ্য জরিপ (BDHS) এর তথ্যানুযায়ী ২০-২৪ বছর বয়সের বিবাহিত মহিলাদের ৫৯ শতাংশ বিবাহের আইনগত বয়সের আগেই বিবাহ সম্পন্ন হয়। তবে মেয়েদের বিবাহের মধ্যবর্তী বয়স (Mediahage) ২০০৭ এর তথ্যানুযায়ী ১৫.৩ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৭-১৮তে ১৬.৩ বয়সে উন্নীত হয়েছে। শহরে ১৮ বছরের নিচে বিবাহের হার ৫৪.৬ এবং গ্রামে ৬০.৭ শতাংশ। বাংলাদেশ জনমিতি ও স্বাস্থ্য জরিপ ২০০৭ এর তথ্যানুযায়ী বাল্যবিবাহের হার ছিল ৬৬ শতাংশ, ২০১১ সালে ৬৫ শতাংশ এবং ২০১৪ সালে ও ২০১৭-১৮ সালে ৫৯ শতাংশ। বিবাহিতদের ৪৮.৮ শতাংশ ১৯ বছরের আগেই সন্তানের মা হয়। (উৎস: BDHS 2017-18)

বাংলাদেশে মেয়েদের মধ্যে বাল্যবিবাহের প্রবণতা বিভিন্ন আদমশুমারী জরিপের তথ্য হতে স্পষ্ট হয়ে উঠে।

বাল্যবিবাহ

বাল্যবিবাহের পরিস্থিতি

মেয়েদের বাল্যবিবাহের হারের পরিবর্তন (১৯৩১–২০১০)

বয়স গ্রুপ	১৯৩১	১৯৬১	১৯৭৪	১৯৮১	১৯৯১	২০০১	২০১০
১০-১৪	২৫.৪	৩১.৮	৮.৮	৭.০	৩.০	৩.২	১.১৩
১৫-১৯	৫৮.১	৮৯.৪	৭১.০	৬৫.৪	৪৯.৬	৩৬.৪	২১.৯০

উপরোক্ত তথ্য হতে দেখা যায় বাংলাদেশের বাল্যবিবাহের হার উল্লেখযোগ্য ভাবে হ্রাস পেলেও এখানো অব্যাহত রয়েছে। মেয়েদের বিবাহের গড় বয়সের পরিসংখ্যান ব্যাখ্যা করলে দেখা যায় ১৯৯১ সাল পর্যন্ত বিবাহের গড় বয়স ১৮ বছরের নিচে ছিল। অর্থাৎ গড় বিবাহের বয়স বাল্যবিবাহের নির্দেশক ছিল। ২০১০ সালে গড় বয়স ১৮.৭ বছর ছিল। বাংলাদেশ জনমিতি এবং স্বাস্থ্য জরিপ (বিডিএইচএস) ২০১১ এর তথ্যানুযায়ী ১৮ বছর পূর্ণ হবার আগে ৬৬ শতাংশ কিশোরীর বিয়ে হয় এবং ১৯ বছরের মধ্যে তিন জনের একজন গর্ভধারণ করে; অর্থাৎ মা হয়। বিগত দুই দশক ধরে (১৯৯৩-৯৪) কিশোরী মায়ের হার ৩৩ শতাংশের মধ্যে রয়েছে। বাংলাদেশের নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যানের অভাবে বাল্যবিবাহের হার সব সময় নিরূপণ করা কঠিন।

বাল্যবিবাহ

বাল্যবিবাহের পরিস্থিতি

বাল্যবিবাহ একটি জটিল সামাজিক বিষয়, যার মূল লিঙ্গ বৈষম্য, সামাজিক ঐতিহ্য এবং দারিদ্র্যের মধ্যে নিহিত। সমাজ জীবনে বাল্যবিবাহের নেতিবাচক প্রভাব বহুমুখী এবং সুদূরপ্রসারী।

বাল্যবিবাহের ক্ষেত্রে স্বামী স্ত্রীর বয়সের ব্যাপক পার্থক্য পারিবারিক জীবনে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা সৃষ্টি করে। বাল্যবিবাহ স্বামী স্ত্রীর দৈহিক ও মানসিক সামঞ্জস্যহীনতা দাম্পত্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাব ফেলে। বাংলাদেশে নারী পুরুষের বিবাহের বয়সের গড় পার্থক্য নিচের সারণীতে দেখানো হলো

নারী পুরুষের বিবাহের বয়সের গড় পার্থক্য (১৯৮১–২০১০)

আদমশুমারী সন	পুরুষ	মহিলা	বয়সের পার্থক্য
১৯৮১	২৩.৯	১৬.৮	৭.৯
১৯৯১	২৪.২	১৮.১	৬.১
২০০১	২৫.১	১৯.০	৬.২
২০১১	২৪.৯	১৮.৬	৬.৩

উৎস : পরিসংখ্যান পকেট বুক ২০১০ এবং অর্থনৈতিক সমীক্ষা।

বাল্যবিবাহ

বাল্যবিবাহের প্রভাব

স্বামীর যৌন সহিসংতার ঝুঁকি ১৮ বছরের কম বয়সের শিশু কনেদের (Child brides) ক্ষেত্রে অধিক। বিশেষ করে শিশু কনের বয়স এবং স্বামীর বয়সের পার্থক্য বেশি হলে সহিংসতার ঝুঁকি বেশি থাকে। বাল্যবিবাহের কারণে নারী ক্ষমতাহীন বলে স্বামীর যৌন সহিংসতা থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে না। অন্যদিকে দারিদ্র্য অথবা আইনগত ও সামাজিক সমর্থনের অভাবে বিকৃত বিবাহ (Abusive Marriage) কন্যা শিশু পরিত্যাগও করতে পারে না।

বাল্যবিবাহ হলো মেয়েদের অধিকার হরণ। বাল্যবিবাহ মেয়েদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দক্ষতা, প্রত্যাশা প্রভৃতি অধিকার হতে বঞ্চিত করে। জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিলের (UNFPA) নির্বাহী পরিচালকের মন্তব্য হলো, বাল্যবিবাহ হলো মানবাধিকার লঙ্ঘনের সনির্বন্ধ ব্যবস্থা, যা মেয়েদের কাছ থেকে তাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং দীর্ঘ ভবিষ্যত আশা আকাংখা ছিনিয়ে নেয়। (Child marriage is an appealling violation of human rights and robs girls of their education, health and long term prospects.) বর্তমানে বাংলাদেশসহ বিশ্বের ১৫৮টি দেশে বিবাহের সর্বনিম্ন বয়স ১৮ বছর নির্ধারণ করা হয়েছে।

বাল্যবিবাহ

বাল্যবিবাহের প্রভাব

অতি অল্প বয়সে দৈহিক ও মানসিক প্রস্তুতির পূর্বে বাল্যবধূকে গর্ভধারণ, শিশু লালন এবং মাতৃত্ব অর্জনের ঝুঁকি গ্রহণ করতে হয়। বিশ্বব্যাপী মাতৃ মৃত্যুর প্রধান কারণ বাল্যবিবাহ এবং কম বয়সে গর্ভধারণ ও শিশু জন্ম দেওয়া। ১৫-১৯ বছর বয়সের নারী মৃত্যুর প্রধান কারণ গর্ভধারণ ও শিশু জন্মদান। অপরিণত মায়ের বেঁচে থাকা শিশুর জন্মকালীন কম ওজন, অপুষ্টি এবং দৈহিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ দেরিতে হয়। বাল্যবিবাহ শিশু মৃত্যু এবং মাতৃ মৃত্যুর কারণরূপে প্রভাব বিস্তার করে।

শিশু কনে (Child brides) সহিংসতা, বিকৃত যৌন ব্যবহার ও বঞ্চনা ঝুঁকিতে থাকে। বাল্যবিবাহ কন্যা শিশুকে পরিবার, বন্ধু বান্ধব ও প্রতিবেশিদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। বাল্যবিবাহের কারণে ব্যক্তি স্বাধীনতার অভাবে সব ধরনের চিত্তবিনোদন, খেলাধূলা ও সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে অংশগ্রহণ হতে নারী বঞ্চিত হয়। যার বিরূপ প্রভাব দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়।

বাল্যবিবাহ

বাল্যবিবাহের প্রভাব

গর্ভধারণের জটিলতা, শিশু জন্মদান ও মাতৃ মুত্যু হার ১৮ বছরের নিচে বিবাহিত মেয়েদের ক্ষেত্রে বেশি। মেয়েদের বয়স ১৮ বছর না হওয়া পর্যন্ত অল্পবয়সী মেয়েদের শরীর, সন্তান ধারণের জন্য প্রস্তুত থাকে না। সময়ের আগে সন্তান ধারণ করলে সেই শিশুর প্রতিবন্ধী হবার ঝুঁকি থাকে। বাল্যবিবাহের কারণে স্বামী স্ত্রীর বয়সের পার্থক্য, দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব, অপরিপক্ক মাতৃত্ব ও পিতৃত্ব পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে নেতিবাচক প্রভাব বয়ে আনে। স্বামী-স্ত্রীর সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। বাল্যবিবাহ নারী নির্যাতনের অন্যতম প্রধান কারণ। বাল্যবিবাহ প্রতিবন্ধী শিশু জন্মদানের সম্ভাবনা বৃদ্ধি করে। বিশেষজ্ঞদের মতে অটিজম-এর সঙ্গে পিতামাতার কম বয়সের সম্পর্ক রয়েছে। শিশুর জন্মকালীন সময়ে পিতামাতার কম বয়স অটিজমের প্রভাবক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

বাল্যবিবাহ

বাল্যবিবাহের প্রভাব

বাংলাদেশে স্বামী বা স্ত্রীর পরকীয়া প্রেমের ক্ষেত্রে বাল্যবিবাহের প্রভাব রয়েছে। স্ত্রীর তুলনায় স্বামীর বয়স বেশি হলে জৈবিক কারণে অনেক সময় স্ত্রী পরকীয়া প্রেমে পড়ে পারিবারিক জীবনে অশান্তি সৃষ্টি করে। অন্যদিকে অপরিণত বয়সে সন্তানের মা হবার কারণে স্ত্রীর চেহারার সৌন্দর্য মারাত্মকভাবে নষ্ট হয়ে যায়। বয়সের পূর্বেই বয়স্ক মনে হয়। এমতাবস্থায় স্বামীর পরকীয়া প্রেমে লিপ্ত হবার প্রবনতা বৃদ্ধি পায়। আর নারীর প্রতি সহিংসতা ও নারী নির্যাতনের অন্যতম প্রধান কারণ পরকীয়া প্রেম। বাল্যাবিবাহ সন্তানদের সামাজিকীকরণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। অপরিণত মাতৃত্ব ও পিতৃত্ব সন্তানদের সমাজিকীকরণে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

বাল্যবিবাহ জনসংখ্যা বৃদ্ধির সহায়ক। মহিলাদের সন্তান উৎপাদনক্ষম বয়স ১৫-৪৯ বছর। বাল্যবিবাহের ফলে প্রজননক্ষম বয়সের অধিক সময় বিবাহিত অবস্থায় থাকার কারণে সন্তান জন্মদানের হার বেশি হবার সম্ভাবনা থাকে। বিলম্ব বিবাহ প্রজননহার হ্রাসের সহায়ক। উপরোক্ত আলোচনা হতে পারিবারিক ও সমাজজীবনে বাল্যবিবাহের সুদূরপ্রসারী বহুমুখী নেতিবাচক প্রভাব স্পষ্ট হয়ে উঠে।

বাল্যবিবাহ

বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সমাজকর্মীর ভূমিকা

বাল্যবিবাহ একটি সামাজিক ব্যাধি এবং সমাজের তৃণমূল পর্যায়ে এর বিস্তার। গ্রামীণ সনাতন জনপদে বাল্যবিবাহের হার অধিক। বাল্যবিবাহ প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজন বাল্যবিবাহের মূল কারণগুলো চিহ্নিত করে সেগুলো দূরীকরণে ব্যবস্থা গ্রহণ।

সমাজকর্মের হস্তক্ষেপ প্রক্রিয়া সমষ্টি সমাজকর্ম এবং সামাজিক কার্যক্রম (Social action) প্রয়োগ করে বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে জনমত গঠন এবং লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণে সচেতনতা বৃদ্ধিতে সমাজকর্মীরা কাজ করতে পারেন। স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে আলোচনা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, গণমাধ্যমে প্রচারণা ইত্যাদির মাধ্যমে বাল্যবিবাহ বিরোধী জনমত গঠনে সমাজকর্মীরা ভূমিকা পালন করতে পারেন।

বাল্যবিবাহ রোধকল্পে প্রচলিত আইন, নীতি এবং সেবাসমূহের উন্নয়নের মাধ্যমে মেয়েদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে সমাজকর্মীরা পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে পারেন। আইনগতভাবে বিবাহের বয়স বৃদ্ধির সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব আইন প্রণেতা ও নীতি নির্ধারকদের সামনে যুক্তিসহকারে উপস্থাপন করতে পারেন। মেয়েদের বিরুদ্ধে বৈষম্য না করতে পিতা মাতা এবং নেতৃস্থানীয়দের উৎসাহিত এবং মেয়েদের জন্য আর্থ-সামাজিক ও নাগরিক সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সমাজকর্মীরা যোগাযোগ কৌশল অনুশীলন করতে পারেন।

বাল্যবিবাহ

বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সমাজকর্মীর ভূমিকা

বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে বৃহৎ জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের মাধ্যমে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার গুরুত্ব অপরিসীম। সমাজকর্মের সহায়ক পদ্ধতি সামাজিক কার্যক্রম (Social action) অনুশীলনের মাধ্যমে সমাজকর্মীরা বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেন।

সমাজকর্মীরা কর্মরত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিশেষ করে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, শিশু ও মাতৃকল্যাণ, স্কুল সমাজকর্ম, চিকিৎসা সমাজকর্ম গ্রামীণ সমস্যা, শহর সমষ্টি উন্নয়ন প্রভৃতি খাতে নিয়োজিত সমাজকর্মীরা বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করতে পারেন।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজকর্ম ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৩ – সামাজিক সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মের অনুশীলন

টপিক – ০৮ মাদকাশক্তি

টপিক ০৮: মাদকাশক্তি

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

মাদকাশক্তি

আধুনিক মানব সভ্যতা যে দু'টি সর্বজনীন সমস্যার সম্মুখীন তার একটি হলো বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এবং অপরটি মাদকাসক্তর ক্রমবিস্তার। এ দু'টিই আধুনিক বিজ্ঞান সভ্যতার অবদান। বিশ্বের ধনী-দরিদ্র সবদেশই এ দুটি সমস্যা দ্বারা আক্রান্ত। মাদকাসক্ত নিছক একটি মানসিক সমস্যা বা সামাজিক অনাচার নয়, বরং এর সঙ্গে রয়েছে আর্থ-সামাজিক বহুবিধ সমস্যার অবিচ্ছেদ্য যোগসূত্র। বিশ্বব্যাপী মাদকাসক্তর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি ও জনমত জাগ্রত করার লক্ষ্যে ১৯৮৯ সাল হতে জাতিসংঘ প্রতি বছর ১৬ জুন আন্তর্জাতিক মাদক প্রতিরোধ দিবস হিসেবে পালন করছে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশে মাদকাসক্তি সামাজিক অনাচার হতে সামাজিক সমস্যার রূপধারণ করেছে।

মাদকাশক্তি

মাদকদ্রব্য কি?

যেসব দ্রব্য মানুষের কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে ও দৈহিক কর্মকান্ডের উপর দীর্ঘস্থায়ী তীব্র প্রভাব ফেলে, সেগুলোকে মাদকদ্রব্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ব্যাপক অর্থে, "মাদকদ্রব্য হলো এমন যে কোন দ্রব্য, যার রাসায়নিক বিক্রিয়ার প্রভাবে প্রাণীর আচার আচরণ ও কাঠামোর মধ্যে পরিবর্তন আসে।" সামাজিক সমস্যার দৃষ্টিকোণ (Social problems approach) হতে, "মস্তিষ্ক এবং স্নায়ুতন্ত্রের উপর প্রত্যক্ষভাবে প্রভাব বিস্তারকারি অভ্যাসগত উপাদান হলো মাদকদ্রব্য বা ড্রাগ।" (A drug is any habit forming substance that directly affects the brain and nervous system.)

মাদকাশক্তি

মাদকাসক্তির ধারণা

মাদকসক্তি বলতে মাদক দ্রব্যের অপব্যবহারকে বুঝায়। মাদকের অপব্যবহার (Drug abuse) বলতে মাদকদ্রব্যের প্রভাবে সৃষ্ট অনুভূতি লাভের প্রবল ইচ্ছায় প্রভাবিত হয়ে মাদকদ্রব্য গ্রহণের নেশা বা আসক্তিকে নির্দেশ করে। যা আসক্ত ব্যক্তির স্বাভাবিক সামাজিক সম্পর্ককে যেমন বিপদগ্রস্ত করে তুলে, তেমনি আসক্তব্যক্তির স্বাস্থ্যের এবং সমাজের জন্য ক্ষতি বয়ে আনে।

ডেভিড জেরি এবং জুলিয়া জেরি প্রণীত কলিন্স সমাজবিজ্ঞান অভিধান (Collins Dictionary Sociology) গ্রন্থের সংজ্ঞানুযায়ী, "মাদকাসক্তি হলো মাদক গ্রহণের শারীরিক ও মানসিক বাধ্যতামূলক তীব্র কামনা। এতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি মাদকদ্রব্য গ্রহণের প্রভাবে সৃষ্ট অস্বাভাবিক দৈহিক ও মানসিক অনুভূতি বা আকাংখা পূরণের তীব্র ইচ্ছার জন্য মাদকদ্রব্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।"

মাদকাশক্তি

মাদকাসক্তির ধারণা

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) সংজ্ঞানুযায়ী, "নেশা বা মাদকাসক্তি এমন মানসিক কখনো বা শারীরিক প্রতিক্রিয়া, যা জীবিত প্রাণী ও মাদকের মিথস্ক্রিয়ার (interaction) মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হয়। প্রতিক্রিয়ার উল্লেখযোগ্য লক্ষণগুলো হলো, মাদকদ্রব্যটি কমবেশি নিয়মিত গ্রহণের তীব্র ইচ্ছা, মাদকদ্রব্য সৃষ্ট প্রতিক্রিয়া পাবার তীব্র আকাঙ্খা অথবা মাদকদ্রব্য না থাকার অস্বস্তি এড়ানোর প্রচেষ্টা। "18 বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সংজ্ঞানুযায়ী, "যদি কোন ব্যক্তি অত্যধিক পরিমাণে কোন ড্রাগ (প্রাকৃতিক বা বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রস্তুত) বার বার গ্রহণ করে এবং যার প্রভাবে এমন কোন অবস্থায় পৌঁছায় যে অবস্থা নিজের ও সমাজের জন্য ক্ষতিকর, তবে তাকে আসক্ত (Addict) বলা হয়।"

জাতিসংঘের বিশেষজ্ঞ কমিটির (Expert Committee on Drugs) সংজ্ঞানুযায়ী, "মাদকাসক্ত হলো ব্যক্তি বা সমাজের জন্য নির্দিষ্ট সময়ান্তর অথবা দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতিকর অবস্থা, যা বারবার মাদকদ্রব্য (স্বাভাবিক অথবা কৃত্রিম) গ্রহণের প্রভাবে সৃষ্টি হয়। (Drug addiction is a state of periodic or chronic intoxication, detrimental to the individual and to society, produced by a repeated consumption of the drug (Natural or synthetic.)

মাদকাশক্তি

মাদকাসক্তির ধারণা

বাংলাদেশে প্রণীত মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ১৯৮৯ এর কার্যকরী সংজ্ঞায় মাদকাসক্ত বলতে "শারীরিক বা মানসিকভাবে মাদকদ্রব্যের উপর নির্ভরশীল ব্যক্তি বা অভ্যাসবশে মাদকদ্রব্য ব্যবহারকারীকে বোঝানো হয়েছে।"

মাদকাশক্তি

মাদকাসক্তির ধারণা

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং অন্যান্য সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে মাদকাসক্তের প্রধান কতগুলো বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়ে উঠে।

•নিয়মিত মাদকদ্রব্য গ্রহণের দুদর্মনীয় ইচ্ছা বা মাদকদ্রব্য গ্রহণ অব্যাহত রাখার বাধ্যতামূলক চাহিদা এবং যে কোন উপায়ে মাদকদ্রব্য লাভের আকাংখা

• মাদকদ্রব্য গ্রহণের পরিমাণ বৃদ্ধির প্রবণতা,

• মাদক সৃষ্ট প্রতিক্রিয়ার উপর মানসিক এবং দৈহিক নির্ভরশীলতা।

• মাদকদ্রব্য না পাবার অস্বস্তি এড়ানোর প্রচেষ্টা;

• মানুষের কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে এবং দৈহিক কর্মকান্ডের উপর মাদক দ্রব্যের দীর্ঘস্থায়ী তীব্র প্রভাব বিস্তার।

মাদকাশক্তি

মাদকাসক্তের কারণ

মাদকাসক্তির কারণ অর্থাৎ মানুষ কেন মাদকাসক্ত হয়-এর উত্তর অনুসন্ধানে বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন তত্ত্ব ও মতামত প্রদান করেছেন। মাদকাসক্তির কারণ ব্যাখ্যায় জৈবিক, মানসিক, ঐতিহাসিক এবং সমাজতাত্ত্বিক দিক হতে অনেকগুলো কারণ উপস্থাপন করা হয়েছে। এখানে মাদকাসক্তির কারণ সংশ্লিষ্ট উল্লেখযোগ্য প্রধান কয়েকটি কারণ আলোচনা করা হলো।

সমাজবিজ্ঞানী এমিল ডুর্খেইম (Emile Durkheim) গবেষণার মাধ্যমে মাদকাসক্তির কারণ উদ্ভাবন করেছেন। মাদকাসক্তির কারণ সম্পর্কে ডুর্খেইমের ব্যাখ্যা হলো, "সমাজ অনুমোদিত আদর্শ ও মূল্যবোধ অনুযায়ী ব্যক্তি যখন সামাজিক লক্ষ্যার্জনে ব্যর্থ হয়, তখন তার মধ্যে হতাশা, সামাজিক বিচ্ছিন্নতা, একাকীত্ব, উদাসীনতা প্রভৃতি দেখা দেয়। এসব মানসিক অস্বাভাবিকতা থেকে মুক্তি পাবার জন্য ব্যক্তি মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে। বাস্তব লক্ষ্যার্জনে ব্যর্থতা থেকে সৃষ্ট হতাশা, বেদনা ও কষ্ট এড়ানোর জন্য মানুষ মাদক দ্রব্যের আশ্রয় গ্রহণ করে। সমাজ অনুমোদিত লক্ষ্যার্জনে (যেমন যোগ্যতা থাকা সত্বেও উপযুক্ত চাকুরী না পাওয়া) ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ যখন ব্যর্থ হয়, তখন তাদের মধ্যে এক ধরনের আদর্শহীনতা জনিত (Normlessness) হতাশা এবং ব্যর্থতাজনিত বিচ্ছিন্নতা বা একাকীত্ব দেখা দেয়। এরূপ অস্বাভাবিক অবস্থা থেকে পলায়ন বা মুক্তির উপায় হিসেবে মাদকদ্রব্য গ্রহণ করার প্রবণতা সৃষ্টি হয়। মাদকাসক্তের মূল কারণ হলো আদর্শজনিত সামাজিক বিচ্ছিন্নতা (Social Anomie)।

মাদকাশক্তি

মাদকাসক্তের কারণ

মাদকাসক্ত বৃদ্ধির ক্ষেত্রে পরিবেশের প্রত্যক্ষ প্রভাব রয়েছে। সামাজিক পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে মাদকাসক্তির কারণ সম্পর্কে নতুন ব্যাখ্যা সমাজবিজ্ঞানীরা উপস্থাপন করেছে। মাদকাসক্তির বেশিরভাগ উদ্ভূভহয় ব্যক্তির নিজের সামাজিক পরিচিতির মোড়কে অনিয়মিত বা কোন বিশেষ অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে মাদকদ্রব্য গ্রহণের পরিণতি হিসেবে। প্রাথমিক পর্যায়ে অনিয়মিত মাদকদ্রব্য ব্যবহারকারীগণ মাদকাসক্ত হিসেবে অন্যান্যদের স্বীকৃতি ছাড়াই মাদকদ্রব্য উপভোগ করে। এ পর্যায়ে মাদকদ্রব্য গ্রহণকারীরা নিজেদের মাদকাসক্ত হিসেবে গণ্য করে না। যখন অনিয়মিত মাদক ব্যবহারের বিষয়টি পিতামাতা, প্রতিবেশি, পুলিশ, শিক্ষকসহ সমাজের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের দ্বারা উদঘটিত হয়, তখন তারা জনগণের সামনে মাদকাসক্ত ব্যক্তি হিসেবে পরিচিতি পায়। সাময়িক মাদক গ্রহণকারীদের মধ্যে ক্রমান্বয়ে অভ্যাসগত মাদকাসক্তের (Habitual drug abuser) সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। সাময়িক এবং অনিয়মিতভাবে মাদকদ্রব্য গ্রহণের মধ্যদিয়ে সমাজে অভ্যাসগত মাদকাসক্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

মাদকাশক্তি

মাদকাসক্তের কারণ

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে মাদকাসক্তির হার বৃদ্ধির কারণ বিশ্লেষণ করলে কতগুলো ভৌগোলিক এবং ঐতিহাসিক কারণ স্পষ্ট হয়ে উঠে। বাংলাদেশে মাদকাসক্তি সাম্প্রতিক দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ার কারণ চোরাপথে মাদকদ্রব্য আন্তর্জাতিক বাজারে পাচারের পথ পরিবর্তন। বাংলাদেশ মাদকদ্রব্যের পাচারের ট্রানজিট রুট হিসেবে উনিশ'শ পঞ্চাশের দশক হতে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এশিয়ার বার্মা, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম ও লাওসের মধ্যবর্তী ৯৫০ কি.মি. পরিধি নিয়ে 'গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গল' এবং ইরান, পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মধ্যবর্তী 'গোল্ডেন ক্রিসেন্ট' এলাকায় প্রচুর পরিমাণে বিভিন্ন ধরনের মাদকদ্রব্য উৎপন্ন হয়। এসব মাদকদ্রব্য গত কয়েক দশক ধরে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো হয়ে ইউরোপ ও আমেরিকায় পাচার হতো। কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যের গমন পথের দেশগুলোতে মাদকদ্রব্য চোরা কারবার সংক্রান্ত কঠোর আইন প্রণীত হওয়ায় মাদকদ্রব্য চোরা কারবারের আন্তর্জাতিক পথ হয়ে উঠে উপমহাদেশ। যার প্রভাবে এ উপমহাদেশে মাদকাসক্তি ব্যাপক হারে ছড়িয়ে পড়ে। বাংলাদেশও ব্যবহারকারী দেশে পরিণত হয়ে পড়েছে। সম্প্রতি ভারত ও নেপাল সীমান্তের 'গোল্ডেন ওয়েজ' এ উৎপাদিত প্রচুর মাদকদ্রব্য বাংলাদেশে আসছে। ভারত ও নেপাল সীমান্তবর্তী 'গোল্ডেন ওয়েজ' ভ্রাম্যমান শোধনাগারে উৎপাদিত প্রচুর হিরোইন আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানির জন্য বাংলাদেশ করিডোর দেশে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশে মাদকদ্রব্য চোরাচালানের আন্তর্জাতিক পরিবহন পথ হিসেবে ব্যবহৃত হতে হতে অন্যতম ব্যবহারকারি দেশে পরিণত হয়েছে।

মাদকাশক্তি

মাদকাসক্তের কারণ

মাদকদ্রব্য গ্রহণে অন্তরঙ্গ সঙ্গীদের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ব্যক্তিগত পর্যায়ে মাদকদ্রব্য গ্রহণের প্রবণতা বা সিদ্ধান্ত শুধু ব্যক্তিত্বের বা পারিবারিক পটভূমির উপর নির্ভর করে না। মাদকদ্রব্য গ্রহণের প্রবণতা অন্তরঙ্গ বন্ধুদের দৃষ্টিভঙ্গির উপর অনেকাংশে নির্ভর করে। সমাজবিজ্ঞানী এ্যাডউইন সাউদারল্যান্ড (Edwin Souther Land) মাদকসক্তির কারণ বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর মতে, প্রাথমিকভাবে মানুষের আচরণ নির্ধারিত হয় ক্ষুদ্র অন্তরঙ্গ দলের (Peer group) নিকট গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত মূল্যবোধ দ্বারা। মাদকদ্রব্য গ্রহণের শিক্ষা মানুষ যে দলের সঙ্গে সম্পৃক্ত সে দলের আদর্শ থেকে শেখে। এ ধরনের দলের মধ্যে পরিবার, প্রতিবেশী দল, অন্তরঙ্গ দল, ধর্মীয় এবং সামাজিক দল অন্তর্ভুক্ত। সমাজবিজ্ঞানী হাওয়ার্ড বেকার (Howard Becker) এর ক্লাসিক গবেষণা "Becoming Marijuana User" এর ফলাফলে দেখা যায়, সামাজিক দল হলো মাদকদ্রব্য গ্রহণের প্রধান ক্ষেত্র। গবেষণায় দেখা যায় অন্তরঙ্গ দল (Peer group) ব্যক্তিগত পর্যায়ে মাদকদ্রব্য গ্রহণে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অন্তরঙ্গ দলীয় পরিবেশে নতুন সদস্যরা, পুরাতন সদস্যদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মাদকাসক্ত হয়।

মাদকাশক্তি

মাদকাসক্তের কারণ

বাংলাদেশে তরুণ ও যুব সমাজের মধ্যে মাদকাসক্তি বৃদ্ধির অন্যতম কারণ হলো বন্ধুদের সঙ্গ দিতে গিয়ে কৌতূহলবশত অথবা সহজ আনন্দ লাভের উপায় হিসেবে মাদকদ্রব্য সেবন, যা পরিণামে নেশায় পরিণত হয়। গবেষণায় দেখা গিয়েছে অন্তরঙ্গ বন্ধুদের প্রভাবে অনেকে মাদকাসক্ত হয়ে পড়ছে।

জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক মাদক নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির তথ্যানুযায়ী নেশাগ্রস্ততার অন্যতম প্রধান কারণ হলো হতাশা। আর্থ-সামাজিক বৈষম্য এবং বেকারত্বজনিত হতাশাগ্রস্ত যুব সমাজ মানসিক দুশ্চিন্তা এবং হীনমন্যতা থেকে সাময়িক মুক্তি পাওয়ার উপায় হিসেবে নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। বাংলাদেশে কর্মসংস্থানহীন হতাশাগ্রস্ত যুব সমাজ অনেক সময় সহজলভ্য মাদকের হাতে জিম্মি হয়ে পড়ছে।

মাদকাশক্তি

মাদকাসক্তের কারণ

বাংলাদেশে স্যাটেলাইট প্রযুক্তির মাধ্যমে বিদেশী চ্যানেলগুলোতে টিভি অনুষ্ঠান ও ছায়াছবি সম্প্রচারিত হয়। এসব অনুষ্ঠানে মদ্যপান এবং মদের আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপন সবসময় প্রচারিত হচ্ছে, যা এদেশের তরুণ ও যুব সমাজকে মাদকদ্রব্য সেবনে উদ্বুদ্ধ করছে। সুস্থ্য আনন্দের সুযোগ যত সংকুচিত হবে, অসুস্থ্য আনন্দের প্রতি ঝোঁক তত বাড়বে।

মাদকাসক্তির মূল কারণ "Friend, Fan and Frustration" অর্থাৎ "বন্ধু, অনুসারী এবং হাতাশা।" নেতিবাচক পারিবারিক পরিবেশ, অনুপার্জিত অবৈধ সম্পদের আধিক্য, পিতামাতার আসক্তিজনিত অভ্যাস, প্রেমে ব্যর্থতা, সামাজিক মূলবোধের অবক্ষয়, দুর্নীতি প্রভৃতি কারণে মাদকাসক্তির হার বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মাদকাশক্তি

মাদকাসক্তি পরিস্থিতি

মাদকাসক্তি একটি ব্যাপক মানবিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক সমস্যা। বাংলাদেশে বিভিন্ন তথ্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে মাদকাসক্তির ব্যাপকতা স্পষ্ট হয়ে উঠে। বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী জেলাগুলোতে হেরোইন পাচারের পরিমাণ বৃদ্ধির সাথে আসক্তের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশে কোটি কোটি টাকার মাদকদ্রব্য চোরা পথে প্রতি বছর আসছে। আইন রক্ষাকারী সংস্থার হাতে কোটি কোটি টাকার মাদকদ্রব্য ধরা পড়ছে। আমের ঝুড়ি, টিফিন কেরিয়ার, বালিশ, পাউডারের কৌটা, দধির হাঁড়ি, ম্যাচবক্স, মোবাইল ফোনের ব্যাটারীর স্থানে ইত্যাদির মাধ্যমে অহরহ পাচার হচ্ছে কোটি কোটি টাকার মাদকদ্রব্য। দৈনিক পত্রিকাগুলোতে প্রকাশিত সংবাদ থেকে দেশে মাদকদ্রব্যের দ্রুত প্রসারের বাস্তব চিত্র ফুটে উঠে।

বাংলাদেশে ১৯৮৫ সালের দিকে প্রায় ১২ লাখ মাদকাসক্ত রয়েছে বলে অনুমান করা হতো। এদের নেশা বাবদ বার্ষিক দু'হাজার কোটি টাকা খরচ হয়।২০ ১৯৯৯ সালে বাংলাদেশে মাদক সংক্রান্ত অপরাধের সঙ্গে জড়িত ২৫ হাজার ৮০২ ব্যক্তির বিরুদ্ধে ২৭ হাজার ৬০৪টি মামলা দায়ের করা হয়।”

মাদকাশক্তি

মাদকাসক্তি পরিস্থিতি

বিগত ২০১১ এর সেপ্টেম্বর মাসে মাদক নিয়ন্ত্রণে সার্কভুক্ত দেশগুলোর অভিজ্ঞতা বিনিময় সম্মেলনে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রীর প্রদত্ত তথ্যানুযায়ী দেশে ৪৬ লাখ মাদকাসক্ত রয়েছে। যারা পঁচিশ হাজার কোটি টাকা ব্যয় করে। দেশে মোট অপরাধের ৩০ শতাংশ মাদক সংশ্লিষ্ট। ২২ পুলিশ সদর দপ্তরের অপরাধ চিত্রের তথ্যানুযায়ী ২০০৫ সালে মাদক সংশ্লিষ্ট অপরাধের সংখ্যা ছিল ১৪ হাজার ১৯৫ টি এবং ২০১০ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৫৬ হাজার ২৪৯ টিতে উন্নীত হয়। জাতিসংঘের মাদক ও অপরাধ বিষয়ক দপ্তর প্রকাশিত বিশ্ব মাদক প্রতিবেদন ২০১৩ এর তথ্যানুযায়ী ২০০৯ সালে বাংলাদেশে এক লাখ ৩০ হাজার, ২০১০ সালে আট লাখ ১২ হাজার এবং ২০১১ সালে ১৪ লাখ ইয়াবা ধরা পড়ে। অবশ্য পুলিশ ও মাদক নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তাদের মতে যে পরিমাণ ইয়াবা ধরা পড়ে তার চেয়ে বহুগুণ বেশি দেশে ব্যবহার হচ্ছে।২০ ২০১৮ সালে এবং ২০১৯ সালে যথাক্রমে ১৭ হাজার ও ৩৬ হাজার মাদকের মামলা নিষ্পতি হয় (দৈনিক বাংলাদেশ: ১৮ মার্চ ২০২০ খনূকর লুৎফুল কবীর: সিও র‍্যাব-৪)। এসব দেশে মাদক পরিস্থিতি যে ভয়াবহ ও বিপজ্জনক তা স্পষ্ট হয়ে উঠে।

মাদকাশক্তি

মাদকাসক্তি পরিস্থিতি

জাতিসংঘের প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশে সাড়ে তিন লাখ মানুষ নানাভাবে মাদক ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। অবৈধ মাদক দ্রব্য আমদানির জন্য প্রতি বছর দশ হাজার কোটির বেশি টাকা পাচার হচ্ছে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী দেশে আসক্তদের ৯০ ভাগ কিশোর তরুণ। তাদের শতকরা ৪৫ ভাগ এবং ৬৫ ভাগ আন্ডারগ্র্যাজুয়েট। উচ্চ শিক্ষিতের সংখ্যা ১৫ শতাংশ। উহার মধ্যে প্রায় ৩০ লাখ মাদক ব্যবসায়ী প্রতিদিন কমপক্ষে দুইশ কোটি টাকায় মাদক কেনাবেচা করে। মাদকসেবীরা গড়ে প্রায় বিশ কোটি টাকার মাদক সেবন করছে।

মাদকাশক্তি

মাদকাসক্তি পরিস্থিতি

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ াধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী মাদক দ্রব্যের পেচণে দৈনিক ৫০-৫০০ টাকায় খরচ করে। মাদকাসক্তের শতকরা পাঁচজন নারী। নারী আসক্তদের ৯০ ভাগের বয়স ১৫-৩৫ বছরের মধ্যে। (উৎস: ১৮ মার্চ ২০২০ দৈনিক ইত্তেফাক অধ্যাপক ও ড. অরূপ রতন চৌধুরী) বাংলাদেশে মাদকাসক্ত মানুষের সংখ্যা প্রায় ৩৬ লাখ। এবং ১৮ বছরের ঊর্ধ্বে বয়সের ৩৫ লাখ ৩৫ হাজারের বেশি। আর সাত বছরের অধিক ১৮ বছরের কম আসক্তদের সংখ্যা ৫৬ হাজারের বেশি। (উৎস: জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট পরিচালিত সমীক্ষা উদ্ভূত। দৈনিক প্রথম আলোর ৪ অক্টোবর ২০১৮)।

অন্য এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় দেশে মাদকাসক্ত মানুষের সংখ্যা ৭৩ লাখ (দৈনিক জনকণ্ঠ: ১৮ মার্চ ২০২০)

মাদকাশক্তি

মাদকাসক্তের প্রভাব

বর্তমান বিশ্বের ধনী-দরিদ্র সকল দেশ মাদকের মরণ ছোবলের শিকার। বিশ্বের কোটি কোটি লোক সর্বনাশা মাদকের নীল দংশনে আক্রান্ত। সারাবিশ্বের যুব সমাজ ক্রমান্বয়ে মাদকের মতো ঘুমন্ত দৈত্যের হাতে জিম্মি হতে চলেছে।

মাদকাসক্তি আর্থ-সামাজিক জীবনে সুদূরপ্রসারী নেতিবাচক প্রভাব বয়ে আনে। আর্থ-সামাজিক জীবনে মাদকের ভয়াবহ বিরূপ প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে ইংল্যান্ডের সাবেক প্রধানমন্ত্রী গ্ল্যাডস্টোন মন্তব্য করছেন, 'যুদ্ধ, মহামারী, দুর্ভিক্ষ' এ তিনটির প্রভাবে যত ক্ষতি হয়, তা একত্রে যোগ করলেও মাদকে যে অনিষ্ট হয়, তা অপেক্ষা ভয়ানক হবে না।" বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে মাদকাসক্তির প্রভাবের উল্লেখযোগ্য কতিপয় দিক এখানে উল্লেখ করা হলো-

মাদকাসক্তদের অস্বাভাবিক আচরণ হলো অপরাধ ও পরাজয়ের মনোভাব। নেশাগ্রস্ত ব্যক্তির সামাজিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে তার মধ্যে অপরাধবোধ ও পরাজয়ের মনোভাব গড়ে উঠে। সে তার পরিবার, সমাজ ও আপনজনদের কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে নেয়। পক্ষান্তরে, নেশাগ্রস্ত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজন, পরিবার প্রতিবেশি এবং বন্ধু-বান্ধব নেশাগ্রস্ত বলে তাকে এড়িয়ে চলে এবং তার প্রতি নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করে। এতে নেশাগ্রস্ত ব্যক্তি নিঃসঙ্গ ও একদিক হয়ে পড়ে। নিঃসঙ্গতার যন্ত্রণা কাটাতে তার অবিরাম নেশার প্রয়োজন পড়ে। সে তার পারিবারিক ও সামাজিক কর্তব্য ভুলে যায়।

মাদকাশক্তি

মাদকাসক্তের প্রভাব

মাদকাসক্ত নৈতিক অবক্ষয় বয়ে আনে। মাদকাসক্ত ব্যক্তি মাদক দ্রব্যের খরচ যোগাতে প্রথম বাড়ির জিনিসপত্র চুরি এবং মিথ্যা বলতে থাকে। এভাবে নেশাগ্রস্ত ব্যক্তির নৈতিক অবক্ষয় শুরু হয়। নেশাগ্রস্ত ব্যক্তির বেশির ভাগের পরিণতি হচ্ছে সন্ত্রাস, হত্যা, চুরি, রাহাজানি, ছিনতাই, পতিতালয়ে গমন, পর্ণ ছবি দর্শন, নারী অপহরণ প্রভৃতি অসামাজিক কাজকর্মে জড়িয়ে পড়া। সহিংসতা, হত্যা, নারী নির্যাতন প্রভৃতি ক্ষেত্রে মাদকাসক্তের প্রত্যক্ষ প্রভাব রয়েছে। যার প্রভাবে সমাজের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ও শৃঙ্খলা ব্যাহত হয়। মাদকাসক্তির একটি নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া হচ্ছে অপরাধ প্রকাতা ও চোরা কারবার। মাদক দ্রব্যের খরচ যোগাতে গিয়ে মাদকাসক্ত ব্যক্তিরা মাদকদ্রব্য পাচারের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। মাদকাসক্তি যেমন নীরবে মানুষকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়, তেমনি মাদক দ্রব্যের চোরাচালান একটা দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক কাঠামোকে পঙ্গু করে তুলে।

সমাজের সবচেয়ে সৃজনশীল যুব শ্রেণি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মাদকের শিকারে পরিণত হয়। মাদকাসক্তির প্রভাবে যুব সমাজ ক্রমান্বয়ে শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক পঙ্গুতে পরিণত এবং সমাজে অপাংক্তেয় হিসেবে বিবেচিত হয়। দেশের সৃজনশীল শ্রমশক্তির ধ্বংস, দেশ ও জাতির জন্য চরম সর্বনাশ বয়ে আনছে।

মাদকাশক্তি

মাদকাসক্তের প্রভাব

পারিবারিক সহিংসতা এবং কিশোর অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে মাদকাসক্তের প্রত্যক্ষ প্রভাব রয়েছে। মাদকাসক্ত পিতা-মাতার সন্তানেরা, সুষ্ঠু সামাজিকীকরণ এবং ব্যক্তিত্ব গঠন হতে বঞ্চিত হয়। ফলে সমাজে কিশোর অপরাধ প্রবণতা ব্যাপক হারে দেখা দেয়। নেশাগ্রস্ত ব্যক্তির পারিবারিক দায়িত্ব পালন ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ার প্রভাবে পারিবারিক কলহ দেখা দেয়। এতে সন্তাদের সামাজিকীকরণ ব্যাহত হয় এবং তাদের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা দেখা দেয়।

মাদকাশক্তি

মাদকাসক্তের প্রভাব

বাংলাদেশে সড়ক দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ চালকদের মাদকদ্রব্য গ্রহণ। ঢাকার মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে ভর্তি হওয়া রোগিদের উপর পরিচালিত ১৯৯০ সালের জরিপ অনুযায়ী ৬৭৯ জন মাদকাসক্তের মধ্যে শতকরা ১৩.৬৫ ভাগ ছিল গাড়ি চালক। এরা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় গাড়ি চালাতে গিয়ে মারাত্মক সড়ক দুর্ঘটনায় শিকার হয়।

মাদকাসক্তের প্রভাবে শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হচ্ছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং বাংলাদেশ সরকারের যৌথ পৃষ্ঠপোষকতায় বঙ্গবন্ধু মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত 'ঢাকা শহরে ছাত্রদের মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার' শীর্ষক জরিপের তথ্যানুযায়ী ঢাকা শহরের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চার ভাগের এক ভাগ ছাত্র কোন না কোনভাবে মাদকদ্রব্যের সংস্পর্শে এসেছে। দীর্ঘ দশ বছর ধরে (মে, ১৯৮৮ হতে নভেম্বর ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত) বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজসহ ৫২টি কলেজের ৪৯৩১ জন ছাত্রের মধ্যে জরিপ চালিয়ে এ তথ্য পাওয়া গিয়েছে।

মাদকাসক্তি স্বাস্থ্যহীনতা এবং জনস্বাস্থ্যের অবনতির জন্য বিশেষভাবে দায়ী। মাদকদ্রব্য গ্রহণের প্রভাবে ফুসফুস, যকৃত, হৃদযন্ত্র প্রভৃতি অঙ্গ আক্রান্ত হয়ে স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে। ঘাতক ব্যাধি ক্যান্সার এবং এইডস বিস্তারের অন্যতম প্রভাবক হলো মাদকদ্রব্য গ্রহণ।

মাদকাশক্তি

মাদকাসক্তের প্রভাব

মানবসম্পদ ধ্বংস ও অপচয়ে মাদকাসক্তের প্রত্যক্ষ প্রভাব রয়েছে। মাদকাসক্তি নীরবে গোটা সমাজকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়। সমাজ গঠনের মূল অণু ব্যক্তি মানুষ, মাদকের নীল দংশনে আস্তে আস্তে নিস্তেজ হয়ে পড়ে। যা সমাজের জন্য সুদূরপ্রসারী মারাত্মক বিপর্যয় ডেকে আনে।

মাদকদ্রব্য গ্রহণের প্রভাবে মানুষের স্বাভাবিক মানবিক গুণাবলী ও অনুভূতি নষ্ট হয়ে যায়। সামাজিক সম্পর্কের বিভিন্ন পর্যায়ে মানুষ পরিচিতি ও মর্যাদা অনুযায়ী ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয়। ফলে পুত্ররূপে, পিতা, স্বামী এবং সমাজের সদস্য হিসেবে, মাদকাসক্ত ব্যক্তির যেসব কর্তব্য রয়েছে তা সে ভুলে যায়। সামাজিক শৃংখলা ও বিধান অমান্য করা তার স্বাভাবিক আচরণে পরিণত হয়। মাদকাসক্তি সমাজের সামগ্রিক উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। উন্নয়নের মূল অণু মানব সম্পদকে ধ্বংস করছে মাদকাসক্তি।

মাদকাশক্তি

মাদকাসক্তি নিরাময়ে সমাজকর্মীর ভূমিকা

পাশ্চাত্যের শিল্পোন্নত দেশে মাদকাসক্তি সমস্যা সমাধানে পেশাদার সমাজকর্মীগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রগুলোতে সমাজকর্মীদের ব্যাপকহারে নিয়োগ করা হয়। সমাজকর্মীরা মাদকাসক্তি সমস্যা মোকাবেলায় গবেষক, প্রশাসক এবং সামাজিক চিকিৎসক হিসেবে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। সমাজকর্মীরা ডাক্তার ও মনোচিকিৎসকের সঙ্গে যৌথভাবে মাদকাসক্তি সমস্যা সমাধানে কাজ করে থাকেন।

মাদকাসক্তি সমস্যা মোকাবেলায় সমাজকর্মের কার্যক্রমকে সাধারণ তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

- মাদকাসক্তি শুরুর পূর্বেই বন্ধ করা (To head off abuse before it begins.);
- মাদকাসক্ত ব্যক্তি এবং তার পরিবারের চিকিৎসা করা (To treat the victims and their families);
- মাদকাসক্তি প্রবণতা সৃষ্টিকারী সামাজিক পরিবেশ দূরীকরণ (To alleviate social conditions that breed abuse) |

মাদকাসক্তি নিরাময়ে সমাজকর্মীর ভূমিকা

মাদকাসক্তি সমস্যা মোকাবেলায় উপরোক্ত তিনটি কার্যক্রমে সমাজকর্মীরা ভূমিকা পালন করতে পারেন। মাদকাসক্তি নিরাময়ে সমাজকর্মীদের ভূমিকা পালনের বিশেষ কতগুলো দিক আলোচনা করা হলো-

মাদকাসক্ত মোকাবেলায় গবেষক হিসেবে সমাজকর্মীরা ভূমিকা পালন করতে পারেন। মাদকাসক্তি বৃদ্ধির কারণ, প্রভাব এবং সমাধানের উপায় সম্পর্কে গবেষণা পরিচালনার গুরুত্ব অপরিসীম। মাদকাসক্তির দৈহিক, সামাজিক, পারিপার্শ্বিক, পারিবারিক, চিকিৎসা, আইন শৃংখলা প্রভৃতি দিকের উপর গবেষণা পরিচালনা করা প্রয়োজন। যাতে সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ হতে মাদকাসক্তি সমস্যা বিশ্লেষণের সুযোগ সৃষ্টি হয়। মাদকাসক্তির পেছনের সক্রিয় উপাদান ও প্রভাবসমূহ চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে গবেষণার বিকল্প নেই। মাদকাসক্তি সমস্যার সামগ্রিক তথ্য সংগ্রহের লক্ষ্যে গবেষণা পরিচালনায় সমাজকর্মীরা ভূমিকা পালন করতে পারে। এক্ষেত্রে সমাজকর্ম গবেষণা কৌশল প্রয়োগ করার সুযোগ রয়েছে।

মাদকাশক্তি

মাদকাসক্তি নিরাময়ে সমাজকর্মীর ভূমিকা

বাংলাদেশে সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে অনেকগুলো মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র কর্মরত রয়েছে। পেশাদার সমাজকর্মের বিভিন্ন পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে এসব নিরাময় কেন্দ্রের প্রদত্ত সেবার কার্যকারিতা বৃদ্ধি করা সম্ভব। সমাজকর্মীরা ব্যক্তি সমাজকর্ম এবং দল সমাজকর্ম (Social Case Work and Group Work) পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের সমস্যা সমাধানে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারেন। দল সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগ করে মাদকাসক্ত সমস্যায় আক্রান্তদের নিয়ে ট্রিটম্যান্ট গ্রুপ (Treatment group) গঠন করে মাদকাসক্ত মোকাবেলায় সাহায্য করতে পারেন।

মাদকাসক্তি নিরাময়ে নিয়োজিত চিকিৎসক, মনোচিকিৎসক, মনোবিজ্ঞানীদের সঙ্গে যৌথভাবে সমাজকর্মীও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারেন। মাদকাসক্তি মূলত ব্যক্তিকেন্দ্রিক সমস্যা। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য থাকায় চিকিৎসা পদ্ধতির মধ্যেও পার্থক্য থাকবে। একই পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে সকল মাদকাসক্ত ব্যক্তির চিকিৎসা করা সম্ভব নয়। চিকিৎসা ব্যবস্থায় কার্যকর সাফল্য বয়ে আনার জন্য এসব দিক তুলে ধরতে পারেন।

মাদকাসক্তি নিরাময়ে সমাজকর্মীর ভূমিকা

মাদকাসক্ত নিরাময়ের ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরশীল দল (Self-help group) সমাজকর্ম কার্যকর পদ্ধতি হিসেবে স্বীকৃত। দল সমাজকর্ম পদ্ধতির দক্ষতা ও কৌশল প্রয়োগ করে মাদকাসক্তদের নিয়ে আত্মনির্ভরশীল দল (Self help group) গঠন করা যায়। মাদকাসক্তদের পুনর্বাসনের পর ভাল থাকার বিশেষ পদ্ধতি হলো গঠনের মাধ্যমে সাহায্য করা। অভিন্ন সমস্যাগ্রস্ত মাদকাসক্ত সদস্যরা নিজেরা নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করে মাদকমুক্ত থাকতে পারেন। এসব দলের সদস্যরা পারস্পরিক সমর্থন এবং কার্যক্রম সম্পর্কিত তথ্যাদি আদান-প্রদানের মাধ্যমে নিজেরাই সমস্যা মোকাবেলা করতে সক্ষম হয়। সমাজকর্মীরা এ জাতীয় আত্মনির্ভরশীল দলীয় পরিবেশে মাদকাসক্ত সদস্যদের পারস্পরিক হাসি-ঠাট্টা, আনন্দ উপভোগের সুযোগ প্রদান, জীবনের প্রতি অধিক আস্থা ও নিয়ন্ত্রণ লাভের অনুভূতি জাগ্রত, আবেগ অনুভূতি আদান-প্রদান, সদস্যদের চাহিদা ও প্রয়োজন পূরণে দলীয় প্রক্রিয়া ব্যবহার করে সাহায্য করেন।

মাদকাশক্তি

মাদকাসক্তি নিরাময়ে সমাজকর্মীর ভূমিকা

সমাজকর্মের সহায়ক পদ্ধতি সামাজিক কার্যক্রম (Social Action) প্রয়োগ করে সমাজকর্মীরা মাদকাসক্তির বিরুদ্ধে গঠনমূলক জনমত গড়ে তোলতে পারেন। গঠনমূলক দলীয় প্রচেষ্টার মাধ্যমে মাদকাসক্তি সমস্যার বিরুদ্ধে ব্যাপক নেতিবাচক জনমত গঠনের ক্ষেত্রে সমাজকর্মীদের ভূমিকা বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। সামাজিক কার্যক্রম (Social Action) পদ্ধতি প্রয়োগ করে সমাজকর্মীরা মাদক সমস্যা ও তার সমাধান সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করতে পারেন। পেশাগত অভিজ্ঞতা প্রয়োগ করে মাদকদ্রব্য বিরোধী সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সমাজকর্মীরা ভূমিকা পালন করতে পারে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজকর্ম ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৩ – সামাজিক সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মের অনুশীলন

টপিক – ০৯ অটিজম

টপিক ০৯: অটিজম

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

অটিজম

অটিজম একটি জীবনব্যাপী স্থায়ী অদৃশ্য প্রতিবন্ধীতা এবং মানসিক প্রতিবন্ধীতার বিশেষ ধরন হলো অটিজম। বিশ্বব্যাপী অটিজম প্রতিবন্ধীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। অটিজমের কারণ উদ্ভাবন এখনো সম্ভব হয়নি। অটিজম হচ্ছে মস্তিষ্ক বিকাশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এক ধরনের প্রতিবন্ধকতা। অটিজমকে বিশেষজ্ঞদের পরিভাষায় অটিজম স্পেকট্রাম ডিজঅর্ডার (Autism Spectrum Disorders-ASD) বলা হয়। অটিজম এবং অটিজম স্পেকট্রাম ডিজঅর্ডার উভয় মস্তিষ্ক বিকাশের জটিল কতগুলো লক্ষণ প্রকাশের সাধারণ পরিভাষা। চিকিৎসকগণ অটিজমকে অনেকগুলো সমস্যার সমষ্টি বলে চিহ্নিত করেছেন।

অটিজম

অটিজমের ধারণা

সাধারণ মানুষের মধ্যে অটিজম সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণার অভাব রয়েছে। এজন্য অটিজম ধারণাটি বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা হয়।

আভিধানিক ব্যাখ্যানুযায়ী, "অটিজম হলো এমন একটি মারাত্মক মানসিক অবস্থা, যা শিশু বয়সে বিকাশ লাভ করে; এতে অন্যের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন বা সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় ব্যক্তি অক্ষম হয়।" (Autism is a serious mental condition that develops during childhood in which one becomes unable to communiate or form relationship with others.) অটিজম হচ্ছে মস্তিষ্ক বিকাশের বিশেষ প্রতিবন্ধকতা, যার প্রভাবে শিশুর সামাজিক যোগাযোগ, সামাজিক আচরণ ও মিথক্রিয়া, সামাজিক কল্পনা, সামাজিক পরিবেশের প্রতি আগ্রহ ইত্যাদি ক্ষেত্রসমূহে ব্যাপক সমস্যা দেখা দেয়। অটিজম এর লক্ষণগুলোর মধ্যে বাইরের পরিবেশের প্রতি কম আগ্রহ প্রকাশ; সমাজের অন্যান্য মানুষ বা বস্তুর প্রতি কার্যকর যোগাযোগ স্থাপনের অক্ষমতা; অভ্যন্তরীণ আবেগ অনুভূতি ও আশা আকাংখার প্রতি পরিপূর্ণ মনোযোগ প্রদানের অক্ষমতা; সামাজিক দক্ষতার অভাব; আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ক ও যোগাযোগ স্থাপনে অস্বাভাবিকতা; উদ্দীপকের প্রতি অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি। মৌখিক এবং দৈহিক যোগাযোগ (Verbal and PhysicalCommunication) এবং আচরণের পুনরাবৃত্তি (Repetitive behaviours) হলো অটিজম আক্রান্ত

অটিজম

অটিজমের ধারণা

অটিজম মস্তিষ্ক বিকাশের প্রারম্ভিক পর্যায়ে শুরু হয়। তবে শিশুর বয়স যখন দুই থেকে তিন বছর হয় তখন এর লক্ষণ প্রকাশ পায়। যেমন অটিজম আক্রান্তদের অনেকে উচ্চশব্দ বা অনেক মানুষের আওয়াজ শুনলে অস্থির হয়ে উঠে। আবার মধ্যম পর্যায়ের অটিজম আক্রান্তরা এরূপ আওয়াজে তেমন অস্বাভাবিকতা দেখায় না। প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে আমরা যা দেখি, শুনি, ঘ্রাণ ও স্বাদ গ্রহণ, স্পর্শ করি, হাসি খুশি ইত্যাদি অভিজ্ঞতা অর্জন ও উপলব্ধি করি, কারো মস্তিষ্ক যে কোন কারণে উপরোক্ত আবেগ অনুভূতি ব্যাখ্যা ও উপলব্ধি করতে সমস্যা হলে তার প্রভাবে কথা বলা, শোনা, উপলব্ধি করা, পড়া, খেলাধূলা করা ইত্যাদিতে প্রতিবন্ধকতা দেখা দেয়। অটিজম আক্রান্ত শিশু তার আবেগ, অনুভূতি ও আচরণের মধ্যে স্বাভাবিক শিশুর মতো সংযোগ স্থাপন করতে পারে না।

অটিজম স্পেকট্রাম ডিজঅর্ডার আক্রান্ত শিশুদের মধ্যে নিচের লক্ষণগুলো পরিলক্ষিত হয়।

* শব্দ পড়া এবং অর্থ বোঝার সমস্যা;
* বার বার একই কাজ করা বা একই শব্দের পুনরাবৃত্তি করা;
*একটা নির্দিষ্ট উপায়ে হাত অথবা পা বা শরীর নাড়ানো;
* কোন কিছু পরিবর্তন করার সমস্যা যেমন নতুন খাদ্য গ্রহণ, বিকল্প শিক্ষককে মেনে নেয়া অথবা কোন খেলনাকে এক স্থান থেকে অন্যস্থানে সরানোর ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দেয়।

অটিজম

অটিজমের ধারণা

অটিজম স্পেকট্রাম ডিজঅর্ডার আক্রান্তদের বুদ্ধি প্রতিবন্ধীতা, স্নায়ু প্রবাহের সমন্বয়হীনতা, মানসিক ও দৈহিক স্বাস্থ্যগত সমস্যা যেমন ঘুম ও পরিপাক তন্ত্রের সমস্যা দেখা দিতে পারে। অনেক অটিজম আক্রান্ত ব্যক্তি প্রত্যক্ষণ দক্ষতা (Visual Skills) গান, চিত্র অঙ্কন ইত্যাদি ক্ষেত্রে উন্নতি করতে দেখা যায়।

অটিজম স্পেকট্রাম ডিজঅর্ডার এর কারণ সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা এখানো নিশ্চিত হতে পারেনি। বিজ্ঞানীরা মনে করেন অটিজম একটি জীনগত (Ginetics) রোগ। বংশগতি এবং পরিবেশের সঙ্গে এর সম্পর্ক রয়েছে। অনেক সময় পরিবারের মধ্যে কেউ আক্রান্ত হলে, সন্তানদের মধ্যে তা হবার সম্ভাবনা থাকে। অটিজম স্পেকট্রাম ডিজঅর্ডার হলো অদৃশ্য প্রতিবন্ধকতা, যার কারণ এখনো সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়নি। মানব মস্তিষ্কের জটিল গঠন প্রক্রিয়ার কারণে অটিজমের প্রকৃত কারণ উদ্ভাবনও কঠিন। বিজ্ঞানীদের মতে মস্তিষ্কের অস্বাভাবিক গঠন এবং মস্তিষ্কের রাসায়নিক ক্রিয়াকলাপ অটিজমের প্রধান কারণ।

অটিজম

অটিজমের ধারণা

পরিবেশগত (Enveronmental) উপাদান শিশুদের মধ্যে অটিজম ঝুঁকি বৃদ্ধি করে। অটিজম ঝুঁকি পরিবেশগত উপাদানের মধ্যে রয়েছে সন্তান ধারণের সময় পিতা মাতার কম বয়স, গর্ভকালীন সময়ে মায়ের অসুস্থতা, জন্মকালীন সময়ে শিশুর মস্তিষ্কে অক্সিজেনের অভাব ইত্যাদি। তবে এসব পরিবেশগত উপাদান স্বয়ং অটিজমের কারণ নয়। এগুলো অটিজমের জীনগত উপাদানের (Autism genetic risk factors) সঙ্গে সমন্বিতভাবে অটিজম ঝুঁকি বৃদ্ধি করে।

বাংলাদেশের অটিজম পরিস্থিতি

বাংলাদেশে অটিজম আক্রান্তদের সঠিক পরিসংখ্যান পাওয়া কঠিন। অটিজম সম্পর্কে জ্ঞান এবং সচেতনতার অভাবে সমস্যার সার্বিক চিত্র পাওয়া সম্ভব নয়। বিশ্ব পরিসংখ্যান অনুযায়ী অটিজম আক্রান্তের সংখ্যা বিগত চল্লিশ বছরে দশগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিভিন্ন গবেষণা হতে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী দেখা যায় উন্নত রোগ নির্ণয় এবং অটিজম সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে অটিজম সম্পর্কে নতুন নতুন তথ্যাদি উদ্ভাবন সম্ভব হচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের অটিজম সংশ্লিষ্ট পরিসংখ্যান হতে দেখা যায় বার্ষিক ১০ থেকে ১৭শতাংশ হারে অটিজম আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এরূপ ক্রমাগত হারে অটিজম আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধির স্বীকৃত কোন কারণ চিহ্নিত করা যায়নি। তবে উন্নত রোগ নির্ণয় পদ্ধতি, পরিবেশগত প্রভাব এবং অটিজম সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি অটিজম আক্রান্তদের সংখ্যা বৃদ্ধির কারণ বলে অনুমান করা যায়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রোগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ কেন্দ্রের (Centers for Disease Control and Prevention-CDC) তথ্যানুযায়ী আমেরিকায় প্রতি ৮৮ জন শিশুর মধ্যে একজন অটিজম স্পেকট্রাম ডিজঅর্ডার আক্রান্ত। গবেষণার ফলাফল হতে দেখা যায় বালিকাদের চেয়ে বালকদের মধ্যে অটিজম চার থেকে পাঁচগুণ বেশি। গবেষণালব্ধ ফলাফলের ভিত্তিতে অনুমান করা হয় আমেরিকায় ৫৪ জন বালকের মধ্যে একজন এবং ২৫২ জন বালিকার মধ্যে একজন অটিজম আক্রান্ত। আমেরিকায় দুই মিলিয়ন অটিজম আক্রান্ত এবং বিশ্বব্যাপী অটিজম আক্রান্তের সংখ্যা দশ মিলিয়ন বলে অনুমান করা হচ্ছে।

অটিজম

বাংলাদেশের অটিজম পরিস্থিতি

বিভিন্ন গবেষণার ফলাফলে দেখা যায় অটিজম উন্নত বিশ্বে তুলনায়মূলকভাবে বেশি। ২০১৮ এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী সর্বোচ্চ সংখ্যক অটিজমের হার নিম্নরূপ (প্রতি দশ হাজার শিশুর মধ্যে)

জাপান ১৬১ জন; যুক্তরাজ্য ৯৪জন; সুইডেন ৭২জন; ডেনমার্ক ৬৮ জন; যুক্তরাষ্ট্র ৬৬ জন; কানাডা ৬৫ জন; অস্ট্রেলিয়া ৪৫ জন; ব্রাজিল ২৭ জন এবং হংকং ১৭ জন; পর্তুগাল ৯.২ জন। জার্মানী, ইতালী, ফ্রান্স, নেদারল্যান্ড প্রভৃতি দেশে অটিজম সংখ্যা কম।

অটিস্টিক আক্রান্ত প্রতিটি শিশুই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে অধিকারী। যার দরুন তাদের সম্পর্কে পূর্বভাস (Prognosis) বা ভবিষ্যদ্বানী করা যায় না। আরোগ্যলাভের সম্ভাবনা কতগুলো বিষয়ের (factors) উপরে নির্ভরশীল বলে বিশেষজ্ঞ উহারা মত দিয়েছেন। যেমন- ছয় বছর বয়সের পূর্বে কথা বলার সক্ষমতা যাদের বুদ্ধাঙ্ক (1Q) ৫০ তার উপর এবং প্রয়োজনীয় কোন দক্ষতার উপস্থিতি।

যাদের অভিন্ন যমজ সন্তান অটিম আক্রান্ত তাদের অন্য যমজ সন্তান অটিজম আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা ৬০-৯৬ শতাংশ। সাধারণ যমজদের ক্ষেত্রে ২৪ শতাংশ। (Centers for Disease Control and Prevention US Department of Health & Human Services)

অটিজম

বাংলাদেশের অটিজম পরিস্থিতি

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো পরিচালিত খানা আয় ব্যয় জরিপ ২০১০ (HIES) এর তথ্যানুযায়ী দেশের মোট জনসংখ্যার ৯.০৭ শতাংশ প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী। তাদের মধ্যে পুরুষ প্রতিবন্ধীর শতকরা হার ৮.১৩ এবং মহিলা ১০.০০ শতাংশ। খানা আয় ব্যয় জরিপ ২০১৬ এর তথ্যানুযায়ী প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর হার ৬.৯৪ শতাংশ এর মধ্যে গ্রামে ৭.২৭ এবং ৬.০৪ শতাংশ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসেবে বাংলাদেশে মোট প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর শতকরা এক শতাংশ অটিষ্টিক। এ হিসেবে বাংলাদেশে অটিস্টিক লোকের সংখ্যা প্রায় দেড় লাখের মতো। বাংলাদেশে উন্নত রোগ নির্ণয় এবং অটিজম সচেতনতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়ায় অটিস্টিক শিশুর সংখ্যা নির্ণয়ের হার ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

অটিজম

অটিজমের প্রভাব

অটিজম একটি জীবনব্যাপী স্থায়ী অদৃশ্য অস্বাভাবিক অবস্থা।
অটিস্টিক শিশু ও বয়স্ক ব্যক্তির আচার আচরণ বিশেষ কতগুলো লক্ষণ দ্বারা উপলব্ধি করা যায়। সাধারণত সামাজিক প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে মানব শিশুর (Infants) বিকাশ ঘটে। জন্মের দু-তিন মাসের মধ্যে শিশুর শব্দ, আঙ্গুল আঁকড়ে ধরা, পরিচিতদের বিশেষ করে মাকে দেখে হাসা, ফেল ফেল করে তাকানো ইত্যাদি আচরণ প্রকাশ পায়। অন্যদিকে, অটিজম আক্রান্ত বেশির ভাগ শিশু দৈনন্দিন মানবীয় মিথস্ক্রিয়া (Human interactions) এবং স্বাভাবিক আচরণ করতে সমস্যার সম্মুখীন হয়। অটিজম নিয়ে বেড়ে উঠা শিশু নিজের নাম ধরে ডাকলে সাড়া দিতে ব্যর্থ হয়, অন্যান্যদের প্রতি আগ্রহ প্রদর্শন হ্রাস, আধো আধো কথা বলতে অস্বাভাবিক দেরি হওয়া ইত্যাদি লক্ষণ দেখা দেয়। অনেক অটিস্টিক শিশু স্বাভাবিক খেলাধূলা করতে সমস্যার সম্মুখীন হয়। অন্যের আচরণ অনুকরণ করতে ব্যর্থ হয়। পিতা মাতার আদর, স্নেহ অথবা রাগ প্রদর্শনের প্রতি প্রতিক্রিয়া করতে ব্যর্থ হয়।

অটিজম

অটিজমের প্রভাব

গবেষণা হতে দেখা যায়, অটিস্টিক শিশুরা পিতা মাতার সঙ্গে বাস না করলেও তাতে অস্বাভাবিকতা পরিলক্ষিত হয়। অন্যের অনুভূতি, চিন্তা ও চেতনা উপলব্ধিতে তারা ব্যর্থ হয়। অটিস্টিক শিশুদের হাসি, হাত পা নাড়া, মুখ বিকৃতি ইত্যাদি তেমন অর্থ বহন করে না। অনেক সময় তারা হতভম্ব বা বিভ্রান্তের মতো আচরণ করে। পাঁচ বছরের শিশুরা সাধারণত অন্যান্যদের বিভিন্ন আচার আচরণের অর্থ উপলব্ধি করতে পারে। কিন্তু অটিজম আক্রান্ত শিশুরা তা পারে না। অটিজম আক্রান্তদের সাধারণ প্রবণতা হলো আবেগ পরিচালনায় সামঞ্জস্যহীনতা এবং হাসি, কান্না বা আক্রমণাত্মক আচরণে মারাত্মক অস্বাভাবিকতা। হতাশা ও ব্যর্থতা থেকে সৃষ্ট প্রতিক্রিয়ায় অটিস্টিক শিশু নিজ মাথায় প্রচন্ড আঘাত, চুল উঠানো অথবা নিজেকে কামড়ানোর মতো অস্বাভাবিক আচরণ করে। অটিজম আক্রান্তদের ভাষাগত সমস্যা অত্যন্ত প্রকট এবং সামাজিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে ভাষার ব্যবহার অত্যন্ত ধীর গতির হয়। দৈহিক ইশারা ইঙ্গিত বুঝতে অটিস্টিক শিশুদের কষ্ট হয়। এমনকি অটিস্টিক আক্রান্ত বয়স্কদেরও দৈহিক ভাষা (Body Language) বুঝতে কষ্ট হয়। অর্থাৎ ভাষার মাধ্যমে আবেগ অনুভুতি প্রকাশ হয় না।

অটিজমের সমস্যায় সমাজকর্মীর ভূমিকা

অটিজম আক্রান্তদের আচরণগত হস্তক্ষেপ প্রক্রিয়া (Behavioral Intervention Process) প্রাথমিক পর্যায়ে কার্যকর ফল বয়ে আনতে পারে। বৈজ্ঞানিক গবেষণা হতে দেখা যায় প্রাথমিক পর্যায়ে গভীর আচরণগত হস্তক্ষেপে অটিস্টিক শিশুর শিক্ষণ, যোগাযোগ দক্ষতা এবং সামাজিক যোগাযোগ দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। অটিজম আক্রান্ত শিশুদের অনুভূতি, সংবেদন, উদ্দীপনা যেমন দেখা, ঘ্রান, শোনা ইত্যাদি প্রক্রিয়াকরণ এবং সমন্বয়ের সমস্যা দেখা দেয়। স্নায়বিক প্রক্রিয়াকরণ সমস্যা (Sensory Processing Problems) মোকাবেলায় সমাজকর্মীরা পেশাগত থেরাপি (Occupational therapy) বা সংবেদন সমন্বয়করণ থেরাপি (Sensory integrations therapy) প্রদানে সহায়তা করতে পারে।

অটিজম সচেতনতা বৃদ্ধি অটিজম সমস্যা মোকাবেলার গুরুত্বপূর্ণ দিক। প্রতি বছর ২ এপ্রিল বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস উদযাপন করা হয়। এক্ষেত্রে সমাজকর্মীরা সেমিনার, আলোচনা সভা, প্রশিক্ষণ কোর্স ইত্যাদি আয়োজন করতে পারে। সরকারি বেসরকারি এজেন্সিতে কর্মরত বিশেষ করে চিকিৎসা সমাজকর্মীরা নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে এরূপ অটিজম সচেতনতা কর্মসূচির আয়োজন করতে পারে।

অটিজমের সমস্যায় সমাজকর্মীর ভূমিকা

অটিজম সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন গবেষণার ফলাফল হতে দেখা যায়, মহিলারা অটিজম আক্রান্ত শিশু জন্মদানের ঝুঁকি হ্রাসে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। গর্ভধারণের আগে এবং তারা গর্ভধারণের পরের মাসগুলোতে ফলিক এসিড (Folic acid) সমৃদ্ধ খাদ্য গ্রহণ করে অটিজম আক্রান্ত শিশু জন্মদান ঝুঁকি হ্রাস করতে পারেন। তদুপরি গর্ভধারণের সময় পিতা মাতার অপ্রাপ্ত বয়সের বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে অটিজম ঝুঁকি হ্রাস করা যায়। এসব ক্ষেত্রে সচেতনতা বৃদ্ধিতে মাতৃ ও শিশুকল্যাণে নিয়োজিত চিকিৎসা সমাজকর্মীগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন।

অটিজম সমস্যা মোকাবেলায় সমাজকর্মের বিভিন্ন হস্তক্ষেপ কৌশল ব্যবহার করা যায়। সমাজকর্মের প্রত্যক্ষ ও সরাসরি হস্তক্ষেপের বিশেষ কৌশল হলো ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম। মানব বিকাশ সংশ্লিষ্ট জ্ঞান ও তত্ত্ব (Theory) ক্লিনিক্যাল সমাজকর্মে অনুশীলন করা হয়। ব্যক্তি ও পরিবেশের মিথস্ক্রিয়া হলো ক্লিনিক্যাল সমাজকর্মে হস্তক্ষেপের মূল কেন্দ্রবিন্দু। অটিজম আক্রান্ত শিশুদের পারস্পরিক মিথক্রিয়া, জীবনমুখী আত্মব্যবস্থাপনা, সামাজিক যোগাযোগ দক্ষতা বৃদ্ধি ইত্যাদি ক্ষেত্রে ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম অনুশীলন প্রত্যাশিত ফল বয়ে আনতে পারে।

অটিজমের সমস্যায় সমাজকর্মীর ভূমিকা

অটিজম সমস্যা মোকাবেলায় সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুশীলন করা প্রয়োজন। এ সমস্যা মোকাবেলায় পিতা মাতাসহ পরিবারের এমনকি প্রতিবেশিদের সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন। সমাজকর্মীরা অটিজম আক্রান্ত শিশুদের পিতা মাতাদের সমন্বয়ে কর্মদল (Task group) গঠন করে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সহায়তা প্রদান করতে পারেন। অটিজম আক্রান্ত শিশুদের অভিন্ন আচরণগত সমস্যা মোকাবেলার দলীয় আলোচনা দক্ষতা বৃদ্ধিতে কার্যকর ফল বয়ে আনতে পারে। অটিজম আক্রান্ত শিশু বা ব্যক্তি বিশেষ জনগোষ্ঠী (Special Population) এ ধারণা পিতামাতা, পাড়া-প্রতিবেশীর মধ্যে প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে দলীয় উদ্যোগ গ্রহণের গুরুত্ব অপরিসীম। পিতামাতা যাতে অটিজম আক্রান্ত শিশুদের বিশেষ সন্তান (Special Child) হিসেবে পরিচিতি দানের মানসিকতা গ্রহণ করতে পারে, সে জন্য তাদের উদ্বুদ্ধ করায় সমাজকর্মীরা ভূমিকা রাখতে পারেন।

সমাজকর্মীদের ভূমিকা হলো অটিজম সমস্যা মোকাবেলায় নিয়োজিত সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের (যেমন বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী ফাউন্ডেশন পরিচালিত অটিজম রিসোর্স সেন্টার এবং অটিস্টিক স্কুল) তথ্যাদি সরবরাহ করে সংশ্লিষ্ট সেবা গ্রহণে সহায়তা করা।

অটিজমের সমস্যায় সমাজকর্মীর ভূমিকা

অটিজম মোকাবেলায় সমাজকর্মীরা সামাজিক কর্মবেষ্টনীর (Social Network) মাধ্যমে ভূমিকা পালন করতে পারেন। সামাজিক কর্মবেষ্টনী হলো অভিন্ন সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি অথবা দলকে কতিপয় সাধারণ সম্পর্ক, সামাজিক মর্যাদা, একই ধরনের কার্যাবলী, অভিন্ন সাংস্কৃতিক ও আঞ্চলিক সম্পর্কের ভিত্তিতে সমস্যা মোকাবেলার প্রচেষ্টা চালানো। নির্দিষ্ট প্রয়োজন ও স্বার্থের ভিত্তিতে সামাজিক কর্মবেষ্টনী গড়ে তোলা হয়। প্রধানত অটিজম সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু, পরিবারের সদস্যগণ, অন্তরঙ্গ দলের (Peer group) নেতা, সহকর্মী, সদস্য নির্ভর সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে সামাজিক কর্মবেষ্টনী গঠিত, প্রয়োজনের সময় যাদের সাহায্য পাওয়া যায়। সমাজকর্মীরা অটিজম আক্রান্তদের সাহায্যার্থে সংশ্লিষ্টদের সমন্বয়ে সামাজিক কর্মবেষ্টনী গঠন করতে পারেন।

অটিজম আক্রান্ত ব্যক্তিদের সেবা ও সমর্থন প্রদানের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হলো স্বেচ্ছাসেবীদের নিয়ে সামাজিক কর্মবেষ্টনী গড়ে তোলা। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সামাজিক কর্মবেষ্টনী সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির পরিবারের সদস্য, প্রতিবেশী, সংগঠনের সদস্য, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সদস্য এবং সমষ্টির সমাজসেবীদের নিয়ে গড়ে তোলা হয়। অটিজম আক্রান্ত ব্যক্তিদের দীর্ঘমেয়াদী ও নির্ভরযোগ্য সেবা প্রদানে সমাজকর্মীরা এরূপ সামাজিক কর্মবেষ্টনী গড়ে তোলতে পারেন। অটিজম বান্ধব সমাজিক কর্মবেষ্টনী বা নেটওয়ার্ক গঠনে দল সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ করা যায়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজকর্ম ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৩ – সামাজিক সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মের অনুশীলন

টপিক – ১০ জলবায়ু পরিবর্তন

টপিক ১০: জলবায়ু পরিবর্তন

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

জলবায়ু পরিবর্তন

বর্তমান বিশ্বের অন্যতম আলোচিত বিষয় হলো জলবায়ু পরিবর্তন এবং তার প্রভাব। ক্রমবর্ধমান বৈশ্বিক উষ্ণতার প্রভাবে জলবায়ুর কিছু মৌলিক পরিবর্তন ঘটছে। ১৮০০ শতাব্দীর মধ্যভাগ হতে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা ০.৬ ডিগ্রী সেলসিয়াস বৃদ্ধি পেয়েছে; যার প্রভাব সমগ্র বিশ্বের পরিবেশের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। মানব জীবনে জলবায়ুর প্রভাব বহুমুখী ও গুরুত্বপূর্ণ।

জলবায়ু পরিবর্তন

জলবায়ু পরিবর্তনের ধারণা

জলবায়ু বলতে একটি বৃহৎ অঞ্চলব্যাপী আবহাওয়ার উপাদানগুলোর দীর্ঘদিনের গড় অবস্থাকে বুঝায়। দৈনন্দিন আবহাওয়ার দীর্ঘদিনের গড় অবস্থাকে জলবায়ু বলা হয়। ভূ-পৃষ্ঠের উপরিভাগে প্রায় এক মাইল পর্যন্ত যে সাধারণ বায়ু বর্তমান, তা শতকরা ২১ ভাগ অক্সিজেন, ৭৮ ভাগ নাইট্রোজেন, ০.০৩ ভাগ কার্বনডাই অক্সাইড এবং নির্দিষ্ট অনুপাতে ওজোন, হাইড্রোজেন ইত্যাদি গ্যাসীয় উপাদান দ্বারা গঠিত। কোন কারণে কার্বন ডাই অক্সাইড, মিথেন, ওজোন, জলীয় বাষ্প ইত্যাদি গ্রীন হাউস গ্যাস অতিরিক্ত উদগীরণের প্রভাবে অর্থাৎ গ্যাসের ঘনত্ব পরিবর্তনের প্রভাবে জলবায়ুর মধ্যে পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। আবহাওয়ার স্বাভাবিক অবস্থায় যে গ্যাসীয় উপাদানগুলো থাকে, তার দু'একটি উপাদানের ঘনত্ব বৃদ্ধি পেলে জলবায়ুতে তার প্রভাব পড়বে এবং জলবায়ুতে পরিবর্তন ঘটবে। জলবায়ু পরিবর্তনের ধারণাটি সংক্ষেপে উদাহরণের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হলো।

জলবায়ু পরিবর্তন

গ্রীন হাউজ ইফেক্ট

গ্রীন হাউজ ইফেক্ট বা প্রভাব বলতে বায়ুতে ক্রমবধূমান কার্বন-ডাই-অক্সাইড এবং সৌর তাপ বিকিরণের মধ্যেকার মিথক্রিয়ার ফলাফলকে বুঝায়।

শীতপ্রধান দেশে শীতকালে ফল, শাকসবজি, ফুল ইত্যাদি উৎপাদনের উদ্দেশ্যে তাপ ও আদ্রতা নিয়ন্ত্রিত কাচের ঘর তৈরি করা হয়। একে গ্রীন হাউজ বলা হয়। গ্রীন হাউজ সূর্যের আলো আসতে বাধা দেয় না, তবে সূর্যের তাপশক্তি খানিকটা কাঁচের আচ্ছাদনের ভিতর ধরে রাখে। তৈল প্রধান মরুময় দেশে গ্রীন হাউজের সাহায্যে ফল, ফুল, শাকসবজি ও সবুজ উদ্ভিদ উৎপাদন করা হয়।

বায়ুমণ্ডলের কার্বন-ডাই-অক্সাইড, নাইট্রাস অক্সাইড, মিথেন, ওজোন, জলীয় বাষ্প ইত্যাদি গ্রীন হাউজ গ্যাস নামে পরিচিত। কারণ ভূ-পৃষ্ঠের তাপমাত্রায় এসব গ্যাস গ্রীন হাউজ বা কাচঘরের দেয়াল বা ছাদের মতো কাজ করে।

জলবায়ু পরিবর্তন

গ্রীন হাউজ ইফেক্ট

কার্বন-ডাই-অক্সাইড একটি গ্রীন হাউস গ্যাস। বাতাসে এর পরিমাণ ০.০৩ ভাগ। সব জীব শ্বসন ক্রিয়ার মাধ্যমে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস বাতাসে ত্যাগ করে। আর সবুজ গাছপালা ও উদ্ভিদ সালোক সংশ্লেষণের সময় কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস গ্রহণ করে। সূর্য রশ্মি যখন ভূ-পৃষ্ঠে পতিত হয়, তখন বাতাসের কার্বন ডাই অক্সাইড সূর্যের আলোর তাপ অর্থাৎ আলোর ইনফ্রা-রেড (Infra-red) রশ্মি শোষণ করে। অন্যদিকে ভূ-পৃষ্ঠের তাপ যখন বিকিরণ হয়ে ফিরে যায়, তখন কার্বন-ডাই-অক্সাইড সে তাপকে সঞ্চিত করে। সঞ্চিত তাপ বাতাসে ফিরে গিয়ে ভূ-মন্ডলকে উষ্ণ রাখে। এই স্বাভাবিক নিয়মকে গ্রীন হাউজ ইফেক্ট (Green House Effect) বলা হয়। বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসের ঘনত্ব বৃদ্ধির সাথে সাথে গ্রীন হাউজ ইফেক্ট বৃদ্ধি পেয়ে পৃথিবীর বায়ুমন্ডলে তাপের বৃদ্ধি ঘটায়।

জলবায়ু পরিবর্তন

গ্রীন হাউজ ইফেক্ট

ভূ-পৃষ্ঠের তাপমাত্রায়, বায়ুমন্ডলের কিছু গ্যাস গ্রীন হাউজ বা কাঁচ ঘরের দেয়াল বা ছাদের মতো কাজ করে। বায়ুমন্ডলের গ্যাসীয় স্তর ভেদ করে সূর্যের রশ্মি পৃথিবীতে পড়ে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত সূর্যের তাপ পৃথিবী ছেড়ে দেয়। অন্যদিকে ভূ-পৃষ্ঠ হতে বিকিরিত তাপ মহাশূন্যে চলে যেতে চায়। কিন্তু এই তাপ কার্বন ডাই অক্সাইড, জলীয় বাষ্পসহ অন্যান্য গ্যাস দ্বারা শোষিত হয়ে বায়ুমন্ডলে থেকে যায়। গ্রীন হাউজ গ্যাস পৃথিবীতে সূর্যের আলোর তাপ পড়তে বাধা দেয় না, কিন্তু বিকিরিত তাপকে মহাশূন্যে ফিরে যেতে বাধা দেয়। সুতরাং গ্রীন হাউজ গ্যাসসমূহের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে বায়ু মন্ডলে তাপ ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এতে বায়ুমন্ডলের উষ্ণতা বৃদ্ধির প্রভাবে ভূ-পৃষ্ঠের উষ্ণতা বৃদ্ধি পায়। আবহাওয়ার উষ্ণতা বৃদ্ধির এই প্রক্রিয়াকে গ্রীন হাউজ প্রতিক্রিয়া (Green House Effect) বলা হয়। গ্রীন হাউজ সৃষ্ট জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি একটি বিশ্বজনীন সমস্যা। যদিও গ্রীন হাউজ গ্যাসের পরিমাণ বৃদ্ধিতে বিশ্বের সবদেশের ভূমিকা সমান নয়।

জলবায়ু পরিবর্তন

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ

পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি: জলবায়ু পরিবর্তন দীর্ঘদিনের গ্রীন হাউজ প্রতিক্রিয়ার প্রভাব। পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি হলো জলবায়ু পরিবর্তনের মূল কারণ। পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধির বিভিন্ন কারণ রয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তন গবেষণার আন্তর্জাতিক সংস্থা ইন্টার গভর্নমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ (Inter Governmental Panel on Climate Change-IPCC) এর তথ্যানুযায়ী বিশ্বে জলবায়ু পরির্তনের প্রধান কারণ পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি। বৈশ্বিক উষ্ণতার কারণে জলবায়ুর কিছু মৌলিক পরিবর্তন ঘটছে। হিমবাহ গলে যাওয়া, সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, অতিবৃষ্টি, বন্যা, সাইক্লোন, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছাস, সুনামী ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ জলবায়ু পরিবর্তনের আভাস দিচ্ছে। অতিরিক্ত কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস ও গ্রীন হাউজ গ্যাস উদগীরণ: ক্ষতিকর কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস এবং গ্রীন হাউজ গ্যাস অতিরিক্ত উদগীরণই জলবায়ু পরিবর্তনের প্রধান কারণ। বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির জন্য দায়ি কার্বন ডাই অক্সাইড এবং গ্রীন হাউজ গ্যাসের অতিরিক্ত উদগীরণ। কার্বন-ডাই-অক্সাইড এবং গ্রীন হাউজ গ্যাস অতিরিক্ত নির্গমণের বিভিন্ন কারণ রয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তন

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ

সজুব বনাঞ্চল ধ্বংস: বনাঞ্চল ধ্বংস এবং জীবাশ্ম জ্বালানী ব্যবহারের জন্য বিগত কয়েক শতাব্দীতে বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইডের ঘনত্ব প্রায় শতকরা ১৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে প্রতি বছর কার্বন ডাই অক্সাইডের ঘনত্ব প্রায় শতকরা ০.৪ ভাগ হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সব জীব শ্বসন প্রক্রিয়ার সময় কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস বাতাসে ত্যাগ করে। অন্যদিকে, সবুজ উদ্ভিদ সালোক সংশ্লেষণের সময় কার্বন ডাই অক্সাইড গ্রহণ করে। বনাঞ্চল ধ্বংসের প্রভাবে সবুজ উদ্ভিদ হ্রাস পাওয়ায় সালোক সংশ্লেষণের মাধ্যমে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস ব্যবহার কম হচ্ছে। যার ফলে বাতাসে এর ঘনত্ব বৃদ্ধির সাথে পৃথিবীর বায়ু মন্ডলে তাপের বৃদ্ধি ঘটাচ্ছে। বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইডের অর্থাৎ গ্রীন হাউজ গ্যাস নিঃসরণ বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে জলবায়ুর পরিবর্তন ও বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

জলবায়ু পরিবর্তন

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ

পারমানবিক বর্জ্য: পারমাণবিক আবর্জনার তেজস্ক্রিয়তা বায়ু দূষণের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। পারমাণবিক কেন্দ্রের আবর্জনা, পারমাণবিক বিস্ফোরণ, পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষার সময় প্রচুর পরিমাণ তেজস্ক্রিয় পদার্থ ছড়িয়ে বায়ু মন্ডলে গ্যাসীয় পদার্থের ভারসাম্য নষ্ট করে।

সুতরাং দেখা যায় গ্রীন হাউজ গ্যাস নিঃসরণ বৃদ্ধিই বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রধান কারণ। ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেনে ২০০৯ সালে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক সম্মেলনে ১৯৪টি দেশ বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধির হার দুই ডিগ্রী সেলসিয়াসের নিচে নামিয়ে আনার জন্য বিশ্বব্যাপী কার্বন নির্গমন হ্রাসের সমঝোতা চুক্তি হয়। গ্রীন হাউজ গ্যাস নির্গমনকারী বিশ্বের ১০টি দেশ ৬৬.৭ শতাংশ গ্যাস নির্গমন করে। গ্রীন হাউজ গ্যাস নির্গমনকারী বিশ্বের নির্বাচিত ১০টি দেশের চিত্র সারণীতে দেয়া হলো।

জলবায়ু পরিবর্তন

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ

বিশ্বের নির্বাচিত ১০টি দেশের গ্রীন হাউজ গ্যাস নির্গমনের বিবরণ

দেশ	মোট নির্গমন কার্বন ডাই অক্সাইড (মিলিয়ন মেট্রিকটনস)	শতকরা নির্গমন
চীন	৭৭১১	২৫.৪
যুক্তরাষ্ট্র	৫৪২৫	১৭.৮
রাশিয়া	১৫৭২	৫.২
ভারত	১৬০২	৫.৩
জাপান	১০৯৮	৩.৬
জার্মানী	৭৬৬	২.৫
কানাডা	৫৪১	১.৮
যুক্তরাজ্য	৫২০	১.৭
দক্ষিণ কোরিয়া	৫২৮	১.৭
ইরান	৫২৭	১.৭

উৎস : অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৩; পৃ-২৮৬।

জলবায়ু পরিবর্তন

বাংলাদেশের মানুষের জীবন-জীবিকায় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বিশ্বব্যাপী উষ্ণতা বৃদ্ধি, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ঘন ঘন সাইক্লোন, জলোচ্ছাস, খরা, অতিবৃষ্টি, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বৈশ্বিক উষ্ণতা ঋতু পরিক্রমাতে এবং ঋতু বৈচিত্র্যে প্রভাব ফেলছে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে ঋতু বৈচিত্র্যের বৈশিষ্ট্য ক্ষুন্ন হচ্ছে। বিশ্ব উষ্ণায়নের (Global Warming) জন্য বাংলাদেশ কোনভাবেই দায়ি না হলেও জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবের এক নির্দোষ শিকার (Innocent Victim) হলো বাংলাদেশ। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থানকে ভবিষ্যতে বিপন্ন করে তুলবে। ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশ বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি ও পরিবর্তনের প্রভাবে অনেক বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আঠার শতাব্দীর মধ্যভাগ হতে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা ০.৬ ডিগ্রী সেলসিয়াস বৃদ্ধি পেয়েছে। তাপমাত্রা বৃদ্ধির এ ধারা অব্যাহত থাকলে ২০৩০ সাল নাগাদ পৃথিবীর তাপমাত্রা ১.৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস বৃদ্ধি এবং ২০৫০ সাল নাগাদ ৬ ডিগ্রী সেলসিয়াস পর্যন্ত বৃদ্ধি পাবে।

জলবায়ু পরিবর্তন

বাংলাদেশের মানুষের জীবন-জীবিকায় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব

জলবায়ু পরিবর্তনের অন্যতম বিরূপ প্রভাব হচ্ছে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি। সমুদ্র তাপ সংরক্ষণ করে। সুতরাং তাপমাত্রা বৃদ্ধির প্রভাবে সমুদ্রের পানির তাপীয় সম্প্রসারণ ঘটে এবং সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পায়। গত একশত বছরে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পেয়েছে ১০ থেকে ২৫ সেন্টিমিটার। পৃথিবীর ৬৩.৪ কোটি মানুষ সমুদ্র উপকূলে বাস করে এবং পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ শহর সমূদ্র উপকূল এলাকায় অবস্থিত। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের কোটি কোটি লোকের জীবন ও জীবিকা বিপন্ন হবার আশঙ্কা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বৈশ্বিক উষ্ণতার প্রভাবে হিমবাহ ও মেরু প্রদেশের বরফ গলার কারণেও সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পায়। যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল একাডেমী অব সায়েন্স এর গবেষকদের মতে বৈশ্বিক উষ্ণতা ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে হিমবাহ ও মেরু অঞ্চলের বরফ গলনের কারণে আগামী ২০৮৭ সালে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা ৫০-১০০ সে.মি. বৃদ্ধি পেতে পারে। যার প্রভাবে আমেরিকার মায়ামী ও ফ্লোরিডার চারপাশের ১৯০০ কিলোমিটার সমুদ্র উপকূল পানির নিচে যাবার আশংকা রয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে বাংলাদেশের এক চর্তুথাংশ ভূমি পানির নিচে তলিয়ে যেতে পারে।

জলবায়ু পরিবর্তন

বাংলাদেশের মানুষের জীবন-জীবিকায় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এবং সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির বিষয়ে সমীক্ষা ও মূল্যায়ন ফলাফল হতে প্রতীয়মান হচ্ছে, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি বিপন্ন ও ঝুকিপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। সাম্প্রতিক বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের নিচের প্রভাবগুলো পরিলক্ষিত হচ্ছে।

- বাংলাদেশে গড় বার্ষিক তাপমাত্রা গত চৌদ্দ বছরে (১৯৯৫-৯৮) মে মাসে এক ডিগ্রী এবং নভেম্বর মাসে ০.৫ ডিগ্রী সে: বৃদ্ধি পেয়েছে।
- গ্রীষ্মকালে সমুদ্রের লোনা পানি দেশের অভ্যন্তরে প্রায় একশ কিলোমিটার পর্যন্ত নদীতে প্রবেশ করছে।
- কৃষি ক্ষেত্রে এর বিরূপ প্রভাব পড়ছে।
- বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণিঝড় সংখ্যা এবং প্রকোপ বৃদ্ধি পেয়েছে। অশান্ত সমুদ্র জেলেদের জীবিকার উপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে।
- বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনের করুণ পরিণতির অন্যতম শিকার হলো বাংলাদেশ। ২৪

জলবায়ু পরিবর্তন

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা মোকাবেলায় সমাজকর্মীর ভূমিকা

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা বিশ্বজনীন সমস্যা। বিশ্ব উষ্ণায়ন বৃদ্ধির জন্য কোনভাবে দায়ি না হলেও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সৃষ্ট সমস্যা সম্পর্কে বাংলাদেশ সচেতন। বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় সরকার অভিযোজন (Adoptation) কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। অন্যদিকে, অনেক বেসরকারি প্রতিষ্ঠান (এনজিও) জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা মোকাবেলায় কাজ করে যাচ্ছে। সমাজকর্মীরা জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যার মোকাবেলায় গৃহীত সরকারি বেসরকারি কার্যক্রমে সমাজকর্মের জ্ঞান ও কৌশল প্রয়োগ করে ভূমিকা পালন করতে পারে।

জলবায়ু পরিবর্তন

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা মোকাবেলায় সমাজকর্মীর ভূমিকা

জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবেলায় সরকার গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্পে সমাজকর্মের সমষ্টি উন্নয়ন (Community development) কৌশল প্রয়োগের সুযোগ রয়েছে। সরকার গৃহীত প্রকল্পসমূহের মধ্যে রয়েছে-

- পরিবর্তিত জলবায়ু উপযোগী ধান (Rice) উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ;
- জলবায়ু পরিবর্তনের চরম হুমকির মুখে প্রতিকূল পরিবেশে অবস্থানকারী নারী ও শিশুর সুপেয় পানি সরবরাহ ও সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প;
- জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবেলায় জলাভূমির বন পুনঃরুদ্ধার ও জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ প্রকল্প;
- জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবেলায় উপকূলীয় এলাকায় বনায়ন প্রকল্প।

এসব প্রকল্প বাস্তবায়নে সমাজকর্মের সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়া সমষ্টি উন্নয়ন (Community Development) পদ্ধতি প্রয়োগের সুযোগ রয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তন

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা মোকাবেলায় সমাজকর্মীর ভূমিকা

জীব বৈচিত্র্য ও প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণের অংশ হিসেবে জালাবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে কমিউনিটি ভিত্তিক উপযোজন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এরমধ্যে উপকূলীয় এলাকায় জনগণের জন্য স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে মাল্টিপারপাস সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।২ এ প্রকল্পে সমাজকর্মের সমষ্টি উন্নয়ন প্রক্রিয়ার প্রয়োগে করা যায়।

বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা মোকাবেলায় এবং পরিবেশ উন্নয়নে সরকারের সঙ্গে আন্তর্জাতিক সংস্থা ও এনজিও কাজ করে যাচ্ছে। তৃণমূল পর্যায়ে জনগণকে পরিবেশ সংরক্ষণে উদ্বুদ্ধকরণ এবং পরিবেশ এবং পরিবেশ সমস্যা মোকাবেলায় জনগণকে সংগঠিত করার ব্যাপারে এনজিও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এসব এনজিওর মাধ্যমে সমাজকর্মের জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োগ করে সমাজকর্মীরা ভূমিকা রাখতে পারেন।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজকর্ম ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৩ – সামাজিক সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মের অনুশীলন

টপিক – ১১ এইচআইভি/এইডস

টপিক ১১: এইচআইভি/এইডস

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

এইচআইভি/এইডস

এইচআইভি / এইডস প্রতিরোধযোগ্য সংক্রামক মরণব্যাধি। বিশ্ব মানবতার মারাত্মক বিপর্যয় ডেকে আনছে এইডস। ক্রমবর্ধমান বিশ্ব জনসংখ্যার সাথে পাল্লা দিয়ে এইচআইভি সংক্রমিত এবং এইডস আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এইডস শুধু একটি রোগ নয়, বিশ্বব্যাপী সামাজিক ও উন্নয়ন সমস্যা হিসেবেও এটি চিহ্নিত। বিশ্বের প্রতিটি দেশেই কমবেশি এইচআইভি/এইডস বিস্তার লাভ করছে। এটি সমকামিতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রোগ (Gay Related Immune Disease-GRID) হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এইচআইভি এবং এইডস (HIV and AIDS) পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হলেও, এক নয়। এইচআইভি আক্রান্তের শেষ পরিণতি হলো এইডস।

এইচআইভি/এইডস

এইচআইভির ধারণা

ভাইরাস (Virus) একটি অতিক্ষুদ্র জীব, যা খালি চোখে দেখা যায় না। মানব ভাইরাস (Human Viruses) বিভিন্ন ধরনের হয়। এইচআইভি (HIV) বিশেষ ধরনের অতিক্ষুদ্র ভাইরাস, যা এইডস (AIDS)-এর মতো মরণব্যাধির প্রধান কারণ। ইংরেজিতে হিউম্যান ইমিউনো ডেফিসিয়েন্সি ভাইরাস (Human Immuno-Deficiency Virus)-কে সংক্ষেপে এইচআইভি (HIV) বলে। উল্লেখ্য এইচআইভি আক্রান্ত মানুষ বছরের পর বছর লক্ষণহীন অবস্থায় বাঁচতে পারে। অনেক গবেষক এইডস-এর পরিবর্তে এইচআইভি রোগ (HIV disease) হিসেবে নির্দেশ করে। এইডস হলো এইচআইভি রোগের শেষ পরিণতি, যা অর্জিত রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেয়।

এইচআইভি/এইডস

এইচআইভির ধারণা

দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্থাৎ রোগের সংক্রমণ হতে দেহকে রক্ষার সামর্থ্যকে বলা হয় রোগ প্রতিরোধ প্রতিক্রিয়া (Immune response)। এটি দেহের রোগ প্রতিরোধ সিসটেম (Body's immune system) দ্বারা সপ্রক্ষিত হয়। দেহের প্রতিরক্ষণ সিসটেমের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে রক্তের প্রতিরক্ষণ সেল (Defense cells) রয়েছে, যেগুলোকে সাদা রক্ত কোষ (White blood cells) বলা হয়। এই সেলের অন্তর্ভুক্ত CD4 কোষ (Cells) রয়েছে (White blood cells-এর একটা Sub-group)। এইচআইভি (HIV) রক্তের CD4 কোষ ধ্বংস করে দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বা সিসটেম আক্রমণ করে। দীর্ঘ সময় এইচআইভি আক্রমণের পর দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে পড়ে। আর যখন দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা মারাত্মকভাবে বিনষ্ট হয় অর্থাৎ রক্তে পর্যাপ্ত পরিমাণে সাদা কোষ (White cells CD4) থাকে না, তখন দেহ নির্দিষ্ট কতগুলো সংক্রমণকে প্রতিরোধ করতে ব্যর্থ হয়। একে এইচআইভি সংশ্লিষ্ট রোগ, (HIV related diseases) বলা হয়।ফর

এইচআইভি/এইডস

এইডস-এর ধারণা

এইডস (AIDS) এর পূর্ণাঙ্গ ইংরেজি রূপ হলো Acquired Immune Deficiency Syndrome-যা সংক্ষেপে AIDS নামে পরিচিত। AIDS এর ব্যাখ্যা হলো-

A = Acquired অর্থ অর্জিত;

I = Immune অর্থ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা;

D = Deficiency অর্থ ঘাটতি;

S = Syndrome অর্থ লক্ষণ বা রোগ সমষ্টি।

সুতরাং এইডস (AIDS) এর বাংলা অর্থ- অর্জিত রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ঘাটতির লক্ষণসমষ্টি (Acquired Immune Deficiency Syndrome-AIDS)। ১৯৮২ সালের দিকে এ নতুন রোগের নাম দেয়া হয়। মানবদেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এইচআইভি (Human Immuno Defeciency Virus-HIV) নামক ভাইরাস দ্বারা মারাত্মকভাবে ধ্বংস হয়ে পড়ে, তখন মানবদেহ নির্দিষ্ট রোগ সংক্রমণ প্রতিরোধ করতে অক্ষম হয়ে পড়ে।[Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) is a set of different symptoms of disease that often occur together, and in the case of AIDS these symptoms are a result of severe damage to the immune system.]

এইচআইভি/এইডস

এইডস-এর ধারণা

এইডস শুধু সমস্যাই নয়, একটি সামাজিক ব্যাধি। সারা বিশ্বে এইডস মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়ার মূল কারণ বিকৃত যৌন রুচিবোধ, অশ্লীলতা, বিকৃত যৌনাচার, বহুগামিতা এবং অজ্ঞতা। গবেষকদের মতে, নারীরা এইচআইভি / এইডস ছড়ানো ও আক্রান্ত হবার অন্যতম মাধ্যম। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার তথ্যানুযায়ী এইচআইভি সংক্রমণের ক্ষেত্রে নারীরা দশগুণ বেশি ঝুঁকিপূর্ণ।

এইচআইভি/ এইডস আক্রান্ত হওয়ার ক্ষেত্রে মহিলারাই বেশি ঝুঁকিপূর্ণ। এর অন্যতম কারণ মহিলাদের নিম্ন আর্থ-সামাজিক অবস্থান। দৈহিক মিলনের মাধ্যমে মহিলা থেকে পুরুষের তুলনায়, পুরুষ থেকে মহিলার আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি তিন গুণ বেশি। মহিলাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ঝুঁকি বেশি। পরিবার প্রধান যদি এইচআইভি/এইডস-এ আক্রান্ত হয় বা মারা যায়, সেক্ষেত্রে পরিবারের অর্থনৈতিক দায়িত্ব মহিলাদের বহন করতে হয়। পরিবারে স্বামী, পুত্র, ভাই বা অন্য পুরুষ সদস্য এইচআইভি/এইডস-এ আক্রান্ত হলে পরিবারের মেয়েরা তাদের পরিচর্যা করে। কিন্তু মহিলা এইচআইভি/এইডস রোগী বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সমাজ ও পরিবারে নিগৃহীত হয়।

এইচআইভি/ এইডস-এর কারণ

বাংলাদেশ জাতীয় এইচআইভি এবং আচরণগত সার্ভিল্যান্সের চতুর্থ পর্যায়ের জরিপের ফলাফল অনুযায়ী সিরিঞ্জের মাধ্যমে শিরায় মাদক গ্রহণকারীদের শতকরা চার ভাগ এইচআইভি আক্রান্ত বলে ধরা পড়েছে। ঝুঁকিপূর্ণ যৌন আচরণকারী জনগোষ্ঠীতে এইচআইভি সংক্রমণের উচ্চহারকে কনসেনট্রেটেড বা ঘনীভূত মহামারী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীতে এইচআইভি শতকরা চার ভাগ, যা মহামারী সূচক শতকরা পাঁচ ভাগ থেকে মাত্র এক ভাগ কম। এইচআইভি আক্রান্ত শতকরা পাঁচ ভাগকে মহামারীর সূচক ধরা হয়। মাদক গ্রহণকারী ছাড়া এইডস ছড়ানোর ক্ষেত্রে ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত বিভিন্ন পর্যায়ের যৌনকর্মী, ট্রাক ও রিকশা চালক এবং হিজড়া জাতীয় জনগোষ্ঠী।

এইচআইভি/ এইডস-এর কারণ

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এইচআইভি / এইডস সংক্রমণের কারণগুলো সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো।

• অরক্ষিত যৌন মিলনের মাধ্যমে সংক্রমণ (Sexual Transmission) : এইডস সমকামিতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রোগ হিসেবে চিহ্নিত। এইচআইভি আক্রান্ত পুরুষ অথবা মহিলাদের সাথে অরক্ষিত যৌন মিলনের (Unprotected sexual intercourse) মাধ্যমে এইডস বেশি ছড়ায়। এইডস আক্রান্ত ব্যক্তিদের বেশির ভাগ অবাধ ও অসতর্ক যৌন মিলনের মাধ্যমে আক্রান্ত হয়েছে। Vaginal পান এবং Oral উভয় ধরনের যৌন মিলনের মাধ্যমে এ রোগ সংক্রামিত হয় ।

• রক্তের মাধ্যমে সংক্রমণ (Transmission through blood) : আক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত বা রক্তজাত সামগ্রী শরীরে গ্রহণের মাধ্যমে এইডস ছড়ায়। আক্রান্ত ব্যক্তির ব্যবহৃত সূঁচ বা সিরিঞ্জ ও অন্যান্য অপারেশনের যন্ত্রপাতি, রেজার ব্লেড বা ক্ষুর জীবাণুমুক্ত না করে পুনরায় ব্যবহার করলে রক্তের মাধ্যমে এইডস ছড়ায়। ।

এইচআইভি/এইডস

এইচআইভি/ এইডস-এর কারণ

• অন্যান্য কারণ : এইচআইভি সংক্রমিত অঙ্গ যেমন চোখের কর্ণিয়া, কিডনি, হৃদপিণ্ড, লিভার দেহে প্রতিস্থাপন করলে। শিরায় মাদকদ্রব্য গ্রহণের সময় একই সুই সিরিঞ্জ এইচআইভি আক্রান্ত ব্যক্তি ও অন্যান্যরা ব্যবহার করলে এবং সংক্রমিত ব্যক্তির চিকিৎসায় ব্যবহৃত অপরিশোধিত চিকিৎসা যন্ত্রপাতি অন্যদের চিকিৎসায় পুনরায় ব্যবহার করলে সংক্রমণ ঘটে। এছাড়া নগরায়ন, শিল্পায়ন, অভিবাসন প্রভৃতি এইচআইভি/এইডস দ্রুত বিস্তারের অন্যতম কারণ। ভ্রাম্যমান শ্রমিক (mobile workers), উদ্বাস্তু, যানবাহন শ্রমিক, জেলে, পর্যটক, খনি শ্রমিক এবং দরিদ্র মানুষ এইচআইভি/এইডস-এর জন্য বেশি ঝুঁকির সম্মুখীন। এ শ্রেণীর মানুষ জীবনমান সম্পর্কে সাধারণত সচেতন নয়, দরিদ্র বিধায় সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত, প্রয়োজনীয় তথ্য এদের কাছে সহজলভ্য নয়। এ কারণে তারা যৌনকর্মীদের সান্নিধ্যে বেশি আসে, আবার এদের মধ্যে ইন্টারভেনাস ড্রাগ ব্যবহারের প্রবণতাও বেশি।

এইচআইভি/এইডস

এইচআইভি/ এইডস-এর কারণ

আলোচ্য চারটি দেহলালা (Body fluids) দ্বারা এইচআইভি সংক্রমিত হয়। এইচআইভি সংক্রমিত রক্ত যদি সরাসরি সংক্রমণমুক্ত রক্তের সঙ্গে মেশে, তা হলে এইচআইভি কার্যকরভাবে সংক্রমিত হয়।

এইচআইভি সংক্রমিত ব্যাধি হলেও নিচে উল্লিখিত মাধ্যমে ছড়ায় না-

১. আক্রান্ত ব্যক্তির শ্বাসপ্রশ্বাস, হাঁচি, কাশি বা থুথুর মাধ্যমে; ২. সাধারণ মেলামেশা, করমর্দন, কোলা-কুলি, একসাথে গল্প করা বা চলা ফেরার মাধ্যমে; ৩. কীট-পতঙ্গ, মাছি ও মশার কামড়ে; ৪. একই বাড়িতে বসবাস, একই বিছানায় ঘুমালে বা একই পায়খানা ব্যবহার; ৪. জামা কাপড়, তোয়ালে/গামছা বা বিছানার চাদর ব্যবহারে; ৫. একই থালা-বাসন ব্যবহার, একই গ্লাসে পানি বা একই কাপে চা পান করলে; ৬. এইডস ভাইরাসমুক্ত রক্ত ও রক্তজাত সামগ্রী গ্রহণের মাধ্যমে।

এইচআইভি/ এইডস-এর কারণ

এইচআইভি/এইডস-এর ভয়াবহ নেতিবাচক প্রভাব সমাজ ও জীবনের সবক্ষেত্রে পড়ছে। এ মরণব্যাধির কারণে আক্রান্ত দেশগুলোর সার্বিক উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে। এইচআইভি / এইডসের প্রভাবে মৃত্যুহার বৃদ্ধি; গড় আয়ু ও প্রজনন হার হ্রাস; স্বাস্থ্যব্যবস্থার উপর চাপ সৃষ্টি; শ্রমের উৎপাদনশীলতা হ্রাস পাচ্ছে। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্র ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এইডস বর্তমানে শুধু স্বাস্থ্য সমস্যা নয়, বরং এইডস একটি দেশকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন করছে। এইডস আক্রান্ত রোগী সমাজে অনেকখানি অবহেলিত। রোগী নিজে ও তার পরিবার অর্থনৈতিক সংকটের সম্মুখীন হচ্ছে। এর প্রভাবে অনেক শিশুর স্কুলে যাওয়া বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এইডস রোগীর স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও চিকিৎসা ব্যয় পরিবারের উপর বাড়তি চাপ সৃষ্টি করছে, যা পরিবারকে দারিদ্র্যের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। পরিবারের ভরণ-পোষণের ব্যয় নির্বাহের জন্য শ্রমজীবী শিশুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। অভিভাবক মারা যাওয়ার ফলে এতিম শিশুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং ছিন্নমূল শিশু বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য একটি বাড়তি চাপ। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও জনমিতিক সকল ক্ষেত্রেই এইচআইভি/ এইডস-এর সুদূরপ্রসারী এবং নেতিবাচক প্রভাব রয়েছে। নিচের ছকে এক নজরে এইচআইভি/এইডস-এর বিভিন্নমুখী প্রভাব দেখানো হলো।

এইচআইভি/এইডস

এইচআইভি/ এইডস-এর কারণ

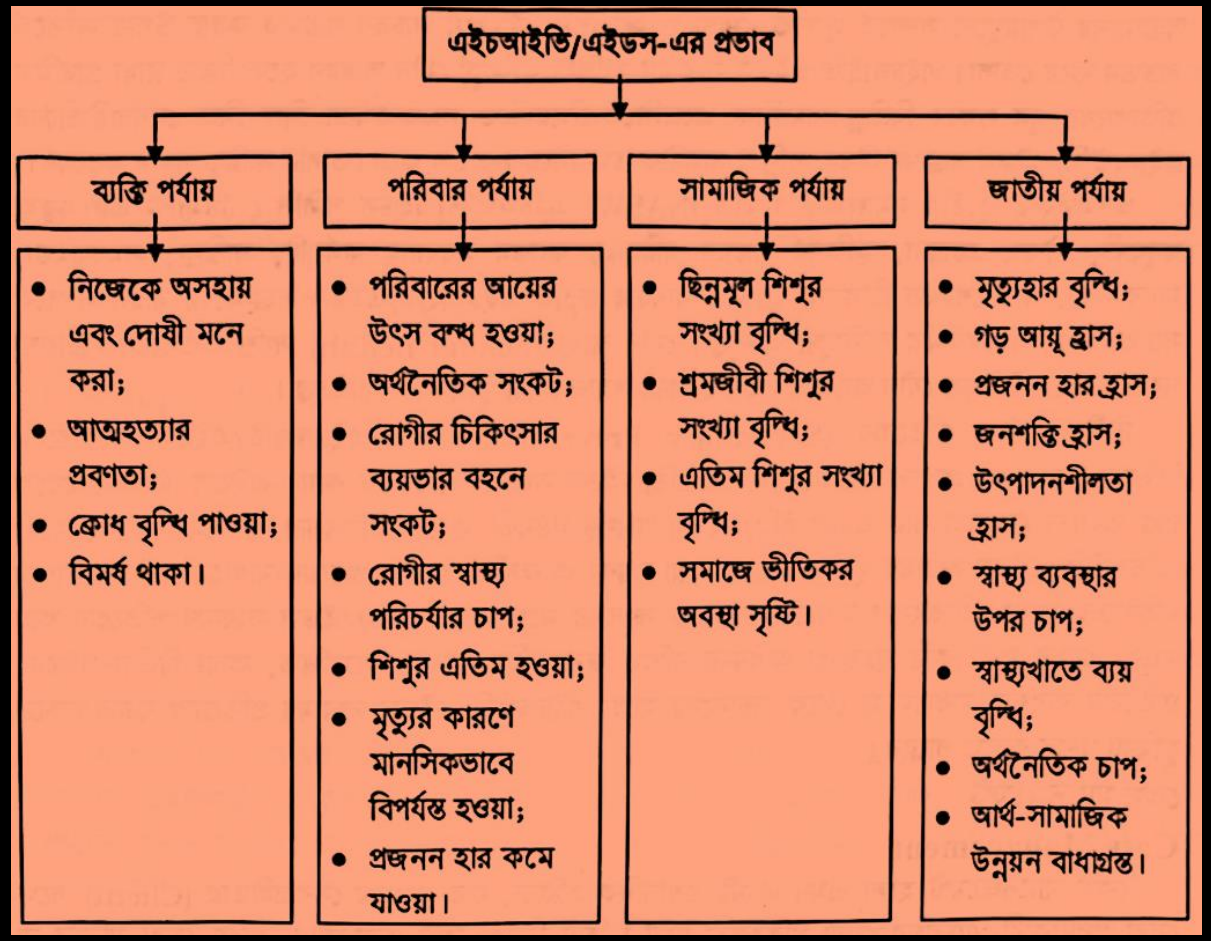

এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধে সমাজকর্মীর ভূমিকা

এইডস প্রতিরোধযোগ্য মরণব্যাধি। এইচআইভি/এইডস প্রতিকারযোগ্য না হলেও প্রতিরোধযোগ্য রোগ। এইচআইভি/এইডস থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় হচ্ছে প্রতিরোধ। শুধু সতর্কতা অবলম্বনের মাধ্যমে এটি প্রতিরোধ করা সম্ভব। সমাজকর্মীরা এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধে যেমন ভূমিকা রাখতে পারে, তেমনি আক্রান্তদের প্রয়োজনীয় মানসিক ও সামাজিক সমর্থন দিয়ে অর্থবহ জীবনযাপনে সাহায্য করতে পারে। এইচআইভি/ এইডস মোকাবেলায় সমাজকর্মীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার মধ্যে রয়েছে প্রতিরোধমূলক হস্তক্ষেপ (Prevention intervention), কেস ব্যবস্থাপনা (Case management), কাউন্সেলিং এবং মনোচিকিৎসা (Counseling and psychotherapy), অন্তরঙ্গ সঙ্গীদের সমর্থন (Peer support) এবং এইচআইভি / এইডস আক্রান্তদের সেবা প্রদানে নিয়োজিতদের সেবা প্রদান (Care for caregivers practitioners)।

এইচআইভি/এইডস

প্রতিরোধমূলক হস্তক্ষেপ

এইচআইভি/এইডস এর কোন প্রতিষেধক এখনো উদ্ভাবন সম্ভব হয়নি। সুতরাং এইডস থেকে বাঁচার উপায় হচ্ছে প্রতিরোধ। প্রাথমিক পর্যায়ে প্রতিরোধ (Primary Prevention) হলো এইচআইভি/এইডস সংক্রমণের উপায়গুলো সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা ও জ্ঞানদান, ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ পরিহার করার উপায় সম্পর্কে সচেতন করে তোলা। এইচআইভি/এইডস সংক্রমণ সংশ্লিষ্ট ঝুঁকিপূর্ণ যৌন আচরণ হতে বিরত রাখা প্রাথমিক প্রতিরোধের মূল লক্ষ্য। বিভিন্ন সামাজিক এজেন্সিতে নিয়োজিত সমাজকর্মীরা নিজ নিজ সেবাগ্রহীতাদের এইচআইভি/এইডস সংক্রমণ বিষয় সংশ্লিষ্ট সামগ্রিক তথ্য দিয়ে সচেতন করে তোলার দায়িত্ব পালন করবেন।

এইচআইভি/এইডস

প্রতিরোধমূলক হস্তক্ষেপ

দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রতিরোধ (Secondary Prevention) হলো এইচআইভি/এইডস আক্রান্তদের বিভিন্নমুখী চিকিৎসা প্রদানের মাধ্যমে এইচআইভি/এইডস সংক্রমণ প্রতিরোধ করা। এইডস চিকিৎসা থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী দেখা যায় এইচআইভি/এইডস আক্রান্ত গর্ভবতী মায়ের চিকিৎসার মাধ্যমে সন্তানের মধ্যে এইচআইভি/এইডস সংক্রমণ ঝুঁকি প্রতিরোধ করা সম্ভব। এ জাতীয় তথ্যাদি প্রচারের মাধ্যমে সন্তান ধারণক্ষম মহিলাদের যথাযথ চিকিৎসার মাধ্যমে মা থেকে সন্তানের মধ্যে এইচআইভি/এইডস সংক্রমণ প্রতিরোধ করা সম্ভব। যেসব সমাজকর্মী দুঃস্থ ও অধিকার বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর সেবায় নিয়োজিত, তারা দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রতিরোধ ব্যবস্থার মাধ্যমে মা থেকে সন্তানদের মধ্যে এইচআইভি/এইডস সংক্রমণ প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করতে পারেন।

এইচআইভি/এইডস

কেস ম্যানেজমেন্ট

কেস ম্যানেজমেন্ট হলো এমন একটি প্রশাসনিক প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে সেবাগ্রহীতার (Client) পক্ষে সেবা প্রদানকারী এজেন্সির সেবা পরিকল্পনা গ্রহণ চাহিদা নির্ণয়, তথ্য অনুসন্ধান, প্রদত্ত সেবা মনিটর বা পরিবীক্ষণ করা হয়। কেস ম্যানেজমেন্ট বলতে সামাজিক এজেন্সি হতে দীর্ঘমেয়াদী সেবাগ্রহীতার সেবা প্রদান পরিকল্পনা গ্রহণ, তথ্যাদি অনুসন্ধান এবং বাস্তবায়িত সেবা পরিকল্পনা মনিটরিং প্রক্রিয়াকে বুঝায়। সামাজিক এজেন্সিগুলো সেবাগ্রহীতার দায়িত্ব গ্রহণ এবং সে দায়িত্ব পালনের জন্য একজন কেস ম্যানেজার নিয়োগ করেন। এইচআইভি/এইডস কেস ম্যানেজমেন্ট-এর ক্ষেত্রে কেস ম্যানেজার হিসেবে সমাজকর্মীরা যেসব ভূমিকা পালন করেন তার মধ্যে রয়েছে-

*এইডস আক্রান্ত ব্যক্তির চাহিদা নির্ণয় এবং এগুলো পূরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

*এইডস আক্রান্ত ব্যক্তির প্রয়োজনীয় সেবা প্রদানের পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং মনিটরিংকরণ।

*আক্রান্ত ব্যক্তিকে প্রাপ্ত এইডস স্বাস্থ্য সেবাসমূহের সঙ্গে সংযুক্তকরণ। dituen a

*ন্যূনতম ব্যয়ে সমন্বিত উপায়ে মানসম্মত সেবা লাভের নিশ্চয়তা প্রদানের মাধ্যমে চিকিৎসা ব্যয় সহনীয় পর্যায়ে হ্রাসকরণ।

কাউন্সেলিং এবং মনোঃচিকিৎসা

এইচআইভি / এইডস আক্রান্তদের সণাক্ত এবং সেবা প্রদানের প্রথম দিকে স্বল্পমেয়াদী কাউন্সেলিং ও মনোঃচিকিৎসার প্রয়োজন হতো। কারণ প্রথম দিকের এইডস আক্রান্ত ব্যক্তিরা কম সময় বেঁচে থাকতো। চিকিৎসার অগ্রগতির সঙ্গে এইডস আক্রান্তদের রোগ নির্ণয়ের পর কমপক্ষে তিন বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকার সম্ভাবনা থাকে। এজন্য এইডস আক্রান্তদের দীর্ঘসময় কাউন্সেলিং ও মনোঃচিকিৎসার প্রয়োজন দেখা দেয়। এইডস আক্রান্ত ব্যক্তির নিশ্চিত মৃত্যু তার জীবনকে নতুনভাবে প্রত্যক্ষণ ও মূল্যায়ন করতে উদ্দীপিত করে। এমতাবস্থায় কাউন্সেলিং এবং মনোঃচিকিৎসা এইডস আক্রান্ত ব্যক্তিকে মানসিক, দৈহিক এবং সামাজিক দিক হতে নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে সাহায্য করে। কাউন্সেলিং এবং মনোচিকিৎসার প্রদানে মনোবিজ্ঞানীসহ সংশ্লিষ্ট পেশাদার ব্যক্তিদের সঙ্গে সমাজকর্মী ভূমিকা পালন করতে পারেন। কাউন্সেলিং ও মনোচিকিৎসার মাধ্যমে এইডস রোগীর সঙ্কট মোকাবেলার সামর্থ্য শক্তিশালীকরণ (Enhanced coping capacity) সম্ভব।

এইচআইভি/এইডস

সঙ্গীদলের সমর্থন

এইচআইভি/এইডস আক্রান্তদের সেবা প্রদানে সমাজকর্মের দলীয় হস্তক্ষেপ (Group interventions) কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে সমাজকর্মীরা সমর্থক দল (Support group) গঠনে সাহায্য করতে পারেন। এইডস সেবা (AIDS services) প্রদানের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হলো সমর্থক দল (Support group) | এইচআইভি/এইডস আক্রান্তদের পারস্পরিক আলোচনার সুবিধার্থে সমাজকর্মীরা সমর্থক দল গঠনে দলীয় প্রক্রিয়া ব্যবহার করেন। এইডস আক্রান্ত অভিন্ন সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তিদের নিয়ে সমর্থক দল গঠন করে তাদের মধ্যে আলোচনা সভার আয়োজন, উপদেশ ও উৎসাহ প্রদানে তথ্য প্রদান এবং অর্থবহ আবেগীয় সমর্থন প্রদানে সমাজকর্মী সাহায্য করেন।

এইডস আক্রান্তদের সেবায় নিয়োজিতদের সমর্থন প্রদান

এইচআইভি/এইডস আক্রান্তদের অনানুষ্ঠানিক সেবা প্রদানকারিগণ (Informal care givers) যেমন বন্ধুবান্ধব, সহকর্মী, স্বামী বা স্ত্রী, প্রতিবেশিসহ বিভিন্ন শ্রেণির লোক দৈহিক ও আবেগীয় সেবা প্রদানে ভূমিকা পালন করেন। কিন্তু প্রয়োজনীয় নির্দেশনার অভাবে তারা এইডস আক্রান্তদের কার্যকর সেবা প্রদানে সক্ষম হয় না। এক্ষেত্রে সমাজকর্মীরা পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োগ করে এইডস আক্রান্তদের অনানুষ্ঠানিক সেবা প্রদানকারীদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করতে পারেন।

এইচআইভি/এইডস মোকাবেলায় সমাজকর্মীদের ভূমিকার গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো আক্রান্ত শিশুদের জন্য নিরাপত্তা বেষ্টনী (Safety net) গড়ে তোলা। বিশ্বব্যাপী দুঃস্থ ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে এইচআইভি/এইডস সংক্রমণ প্রসারিত হওয়ায় আক্রান্ত শিশুরা অরক্ষিত হয়ে পড়ছে। দরিদ্র ও বঞ্চিত শ্রেণির এইডস আক্রান্ত শিশুদের কল্যাণে সমাজকর্মীদের দায়িত্ব পালনের সুযোগ রয়েছে ।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজকর্ম ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৩ – সামাজিক সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মের অনুশীলন

টপিক – ১২ অনুশীলনী বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

অনুশীলনী বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

১। পুষ্টি কী?

ক. খাদ্য　　খ. খাদ্যের উপাদান

গ. জৈবিক প্রক্রিয়া　　ঘ. খাদ্যের ফল

২। গলগণ্ডের জন্য দায়ী কী?

ক. ভিটামিনের অভাব　　খ. আয়োডিনের অভাব

গ. প্রোটিনের অভাব　　ঘ. ক্যালসিয়ামের অভাব

৩। আদমশুমারী ২০১১ এর প্রাথমিক তথ্যানুযায়ী বাংলাদেশে বার্ষিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার-

ক. ১.৩৪%　　খ. ১.৩৭%

গ. ১.৪৮%　　ঘ. ১.৩৭%

৪। অটিজম কী?

ক. দৈহিক প্রতিবন্ধিতা　　খ. মানসিক প্রতিবন্ধিতা

গ. স্নায়বিক প্রতিবন্ধিতা　　ঘ. মস্তিষ্কের নিউরোন সংশ্লিষ্ট প্রতিবন্ধিতা

অনুশীলনী বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

৫। নিচের কোনটি বেকারত্ব?

ক. কর্মোক্ষম হয়েও কর্মহীন অবস্থা খ. ইচ্ছাকৃতভাবে কর্মহীন অবস্থা

গ. শারিরীক বা মানসিক বিকলাঙ্গতার কারণে কর্মহীন থাকা

ঘ. উপরের সবগুলোই সঠিক

৬। বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সহায়ক কারণ হিসেবে অন্যতম প্রভাব বিস্তারকারী নিয়ামক কোনটি বলে তুমি মনে কর?

ক. ভূমির উর্বরতা খ. শিল্পভিত্তিক সমাজ কাঠামো

গ. কৃষিভিত্তিক সমাজ কাঠামো ঘ. উপরের সবগুলো সঠিক

৭। বাংলাদেশে বিরাজমান বেকার সমস্যার কারণ হিসেবে যা বলা যায় তা হলো-

ক. আবাদী ভূমির পরিমান হ্রাস খ. শিল্প কারখানার অপর্যাপ্ততা

গ. বাস্তবসম্মত শ্রম ও কর্মসংস্থান নীতির অভাব ঘ. উপরের সবগুলোই সঠিক

অনুশীলনী বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

৮। জাতিসংঘের ব্যাখ্যানুযায়ী মাদকাসক্তির বৈশিষ্ট্য হলো-
i. নিয়মিত মাদকদ্রব্য গ্রহণের দুর্দমনীয় ইচ্ছা
ii. মাদকের পরিমাণ বৃদ্ধির প্রবণতা
iii. মাদকদ্রব্যের উপর নির্ভরশীলতা
নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i এবং iii　　খ. ii এবং iii
গ. i, ii এবং iii　　ঘ. I

৯ । কোনো ব্যক্তির বেকারত্ব যেসব সমস্যা সৃষ্টি করে, সেগুলো হলো-
i. ব্যক্তি জীবনে অসঙ্গতি সৃষ্টি করে
ii. পারিবারিক জীবনে বিশৃঙ্খলা বয়ে আনে
iii. সামাজিক জীবনে সমস্যা সৃষ্টি করে
নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i এবং ii　　খ. ii এবং iii
গ. i, ii এবং iii　　ঘ. i এবং iii

অনুশীলনী বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১০-১২নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

নুসরাত নবম শ্রেণিতে পড়াকালীন সময়ে তার মামাতো ভাই সুমনের সঙ্গে বিবাহ হয়। বিবাহের সময় তার বয়স ছিল মাত্র ১৫ বছর। অথচ তার স্বামীর বয়স ছিল ২৮ বছর। বিবাহের দেড় বছরের মধ্যে নুসরাত কন্যা সন্তনের জন্ম দেয়। এখন তার দুই মেয়ে এবং দুই ছেলে। কম বয়সে অধিক সন্তান জন্ম দেয়ায় নুসরাতের দৈহিক সৌন্দর্য লোপ পেতে থাকে। যার প্রভাবে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের অবনতি ঘটে।

১০। বাল্যবিবাহের সঙ্গে নিচের কোন সমস্যার সম্পর্ক নেই?

ক. নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতা
খ. জনসংখ্যা বৃদ্ধি
গ. অটিজম
ঘ. অসম পিতৃত্ব

অনুশীলনী বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

১১। নিচের কোন কোন সমস্যা মোকাবেলায় আত্মনির্ভরশীল দল (Self-help group) গঠনের সুযোগ রয়েছে?

ক. বাল্যবিবাহ ও অটিজম
খ. অটিজম ও মাদকাসক্তি
গ. মাদকাসক্তি এবং এইচআইভি/এইডস
ঘ. এইচআইভি/এইডস

১২। উদ্দীপকে উল্লেখিত নুসরাতের সমস্যা যে সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি করে, তা হলো-

i. জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে
ii. দরিদ্রতা সৃষ্টির নিয়ামক হিসেবে কাজ করে
iii. ধর্মীয় বিধি নিষেধ অমান্য করে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i এবং ii
খ. ii এবং iii
গ. i, ii এবং iii
ঘ. i এবং iii

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজকর্ম ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৩ – সামাজিক সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মের অনুশীলন

টপিক – ১৩ সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

ছকটি দেখ এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

ক. ছকটি কী নির্দেশ করে? শূন্যস্থানে সেটি বসিয়ে ছকটি সম্পূর্ণ কর।

খ. বর্ণবৈষম্য ও সাম্প্রদায়িকতার প্রভাব সামাজিক সমস্যা সৃষ্টির ক্ষেত্রে কী ভূমিকা পালন করে?

গ. 'ক' প্রশ্নের জন্য তোমার দেওয়া উত্তরের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. তোমার মতে ছকটি কী যথার্থ? তোমার মতামতের যৌক্তিক বিশ্লেষণ কর।

৩। উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

জসীম মিয়া একসময় সচ্ছলভাবে জীবনযাপন করত। অপরিকল্পিত পরিবার গঠনের কারণে আজ সে দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত। তার দুই ছেলে তিন মেয়ের সংসারে নুন আনতে পানতা ফুরায় অবস্থা। সন্তানদের ঠিকমতো লেখাপড়াও করাতে পারেননি তিনি। বড় ছেলে সুমন ভালোভাবেই মাধ্যমিকে উত্তীর্ণ হয়েছিল। এরপরই সে বিপথে চলে যায়। পরিবারের দুরবস্থায় হতাশা এবং অসৎসঙ্গে মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে। মাদকের খরচ যোগাতে সে ছিনতাই, চাঁদাবাজি ইত্যাদিতে জড়িয়ে পড়ে। জসীম মিয়া ছেলের এ অবস্থা দেখে চোখে অন্ধকার দেখে। একসময় একজন সমাজকর্মীর পরামর্শে জসীম মিয়া তার ছেলে সুমনকে একটি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে ভর্তি করে দেন।

ক. মাদকাসক্তি বলতে কী বুঝ?

খ. মাদকাসক্তের প্রধান বৈশিষ্টগুলো কী কী?

গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত সুমনের অবস্থা সামাজিক সমস্যা সৃষ্টির একটি অন্যতম নিয়ামক। ব্যাখ্যা কর।

ঘ.জসীম মিয়াকে দেওয়া সমাজকর্মীর পরামর্শের আলোকে মাদকাসক্ত নিরাময়ে সমাজকর্মীর ভূমিকা মূল্যায়ন কর।

THANK YOU